MADHHYA JUGER BANGLA SAHITYA (SORAS THEKE ASTADASH SATABDI)

MA [Bengali]

BNGL - 703C

First Semester

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr. Munmun Gangapadhyay

Associate Professor of Rabindra Bharati University

Author

Dr. Shyamal Krishna Ray

Copyright © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই-ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বই ম্যাপিং
প্রথম অধ্যায় ঃ চৈতন্য চরিতামৃত উদ্দেশ্য, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচরিতামৃতের গঠন, রীতি ও বিষয়বস্তু, তত্ত্ববস্তু ঃ মধ্যলীলা - অষ্টম পরিচ্ছেদ, চৈতন্যচরিতামৃত - মধ্যলীলা : অষ্টম পরিচ্ছেদ, রায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকার, কৃষ্ণদাস কবিরাজের কবি প্রতিভা	**একক - ১** **(পৃষ্ঠা ১-১৪)**
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃপদরত্নাবলী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত উদ্দেশ্য, পদরত্নাবলীর পরিচয়, পদরত্নাবলীর বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রনাথ ঃ বৈষ্ণবপদাবলী ও পদরত্নাবলী, পদরত্নাবলীর বিন্যাস পদ্ধতি, দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা, বিরহ মিলনের মানস রাজ্য, শেষে গৌরাঙ্গ বিষয় কবিতা বসানোর কারণ, লিরিকে ভঙ্গী ও ভাষা, রবীন্দ্র সুবাসিত বৈষ্ণব কবিতা	**একক - ২** **(পৃষ্ঠা ১৫-৩২)**
তৃতীয় অধ্যায় ঃপদ্মাবতী উদ্দেশ্য, কবি পরিচয়, কবি প্রতিভা, আত্মমূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্ন, কাব্যের উৎস, কাব্যের কাহিনি, পদ্মাবতী কাব্যের ভাষা, পদ্মাবতী কাব্যে সঙ্গীত, পদ্মাবতী কাব্যে সমাজ ও সংস্কৃতি	**একক - ৩** **(পৃষ্ঠা ৩৩-৪৮)**
চতুর্থ অধ্যায় ঃ ময়মনসিংহ - গীতিকা উদ্দেশ্য, গীতিকার ধারণা ও মৈমনসিংহ গীতিকা, ময়মনসিংহ গীতিকার সৃষ্টি, শ্রষ্ঠা ও সংগ্রাহক, আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন, ময়মনসিংহ গীতিকায় সমাজভাবনা, মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ময়মনসিং গীতিকা, নির্বাচিত গীতিকার সাধারণ পরিচয়, ময়মনসিংহ গীতিকার কাব্য সম্পদ	**একক - ৪** **(পৃষ্ঠা ৪৯-৬১)**

সূচীপত্র

টিপ্পনী

প্রথম অধ্যায় ঃ চৈতন্য চরিতামৃত (পৃষ্ঠা ১-১৪)

১.০ ভূমিকা

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চৈতন্যচরিতামৃত

১.৩ চৈতন্যচরিতামৃতের গঠন, রীতি ও বিষয়বস্তু

১.৪ তত্ত্ববস্তু ঃ মধ্যলীলা - অষ্টম পরিচ্ছেদ

১.৫ চৈতন্যচরিতামৃত - মধ্যলীলা : অষ্টম পরিচ্ছেদ

১.৬ রায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকার

১.৭ কৃষ্ণদাস কবিরাজের কবি প্রতিভা

১.৮ আত্মমূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্ন

১.৯ উত্তর লিখে পাঠানোর জন্য প্রশ্নাবলী

১.১০ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পদরত্নাবলী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত (পৃষ্ঠা ১৫-৩২)

২.০ ভূমিকা

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ পদরত্নাবলীর পরিচয়

২.৩ পদরত্নাবলীর বৈশিষ্ট্য

২.৪ রবীন্দ্রনাথ ঃ বৈষ্ণবপদাবলী ও পদরত্নাবলী

২.৫ পদরত্নাবলীর বিন্যাস পদ্ধতি

২.৬ দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা

২.৭ বিরহ মিলনের মানস রাজ্য

টিপ্পনী

২.৮ শেষে গৌরাঙ্গ বিষয় কবিতা বসানোর কারণ

২.৯ লিরিকে ভঙ্গী ও ভাষা

২.১০ রবীন্দ্র সুবাসিত বৈষ্ণব কবিতা

২.১১ আত্মমূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্ন

২.১২ উত্তর লিখে পাঠানোর জন্য প্রশ্নাবলী

২.১৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

তৃতীয় অধ্যায় ঃ পদ্মাবতী **(পৃষ্ঠা ৩৩-৪৮)**

৩.০ ভূমিকা

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ কবি পরিচয়

৩.৩ কবি প্রতিভা

৩.৪ আত্মমূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্ন

৩.৫ কাব্যের উৎস

৩.৬ কাব্যের কাহিনি

৩.৭ পদ্মাবতী কাব্যের ভাষা

৩.৮ পদ্মাবতী কাব্যে সঙ্গীত

৩.৯ পদ্মাবতী কাব্যে সমাজ ও সংস্কৃতি

৩.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩.১১ সহায়ক গ্রন্থ

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ময়মনসিংহ – গীতিকা (পৃষ্ঠা ৪৯-৬১)

৪.০ ভূমিকা।

৪.১ উদ্দেশ্য।

৪.২ গীতিকার ধারণা ও মৈমনসিংহ গীতিকা।

৪.৩ ময়মনসিংহ গীতিকার সৃষ্টি, শ্রষ্ঠা ও সংগ্রাহক। ৪.৪

আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন।

৪.৫ ময়মনসিংহ গীতিকায় সমাজভাবনা।

৪.৬ মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ময়মনসিংহ গীতিকা।

৪.৭ নির্বাচিত গীতিকার সাধারণ পরিচয়।

৪.৮ ময়মনসিংহ গীতিকার কাব্য সম্পদ।

৪.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলী।

৪.১০ সহায়ক গ্রন্থাবলী।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মুখবন্ধ / ভূমিকা

টিপ্পনী

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য (ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী), বইটি থেকে যে সব তথ্য জানা যাবে সেগুলি হল

ক) চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য লীলা : অষ্টম পরিচ্ছেদ) ঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত

খ) পদরত্নাবলী ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

গ) পদ্মাবতী ঃ সৈয়দ আলাওল : দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

ঘ) ময়মনসিংহ গীতিকা (মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা)

ঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

প্রথম অধ্যায়

।। চৈতন্য চরিতামৃত।।

১.০ ভূমিকা

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চৈতন্যচরিতামৃত

১.৩ চৈতন্যচরিতামৃতের গঠন, রীতি ও বিষয়বস্তু

১.৪ তত্ত্ববস্তু ঃ মধ্যলীলা – অষ্টম পরিচ্ছেদ

১.৫ চৈতন্যচরিতামৃত – মধ্যলীলা : অষ্টম পরিচ্ছেদ

১.৬ রায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকার

১.৭ কৃষ্ণদাস কবিরাজের কবি প্রতিভা

১.৮ আত্মমূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্ন

১.৯ উত্তর লিখে পাঠাবার জন্য প্রশ্নাবলী

১.১০ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

টিপ্পনী

১.০ ভূমিকা ঃ

শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্য জীবন কাহিনি অনুশরনে রচিত চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ বা চরিত কাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ শাখা। প্রাচীনযুগে ভারতীয় সাহিত্যে সংস্কৃত ও পালি ভাষায় অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত', 'ললিতবিস্তর' প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। 'শঙ্করদিগ্বিজয়' গ্রন্থে রচিত হয়েছে শঙ্করাচার্যের জীবনী। কিন্তু চৈতন্য আবির্ভাবের আগে বাংলা ভাষায় অন্য কোনো মহাপুরুষের জীবন কাহিনি অবলম্বনে কোনো গ্রন্থ রচিত হয় নি। তাই বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য জীবনী গ্রন্থগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) যে অলোক সামান্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার প্রভাব শুধু গৌড় বঙ্গে নয় নীলাচল সহ প্রায় সমগ্র ভারত ভূমি কে আলোড়িত করে তুলেছিল। মানবপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের ফলে তিনি হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথাকে ভেঙ্গে হিন্দু সমাজকে সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছে। নাম সংকীর্তন প্রচার ও পদব্রজে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাপ্ত পরিভ্রমণ করে রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমের মহিমাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি অনন্য সাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করায় তাঁর লোকোত্তর দিব্য জীবন অবলম্বনে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় বিভিন্ন জীবনীকার জীবনীগ্রন্থ বা চরিতকাব্য রচনা করতে এগিয়ে

আসায় বাংলা সাহিত্যে এক মূল্যবান শাখার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা যায় ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে এই জাতীয় গ্রন্থগুলি রচিত হওয়ায় তার মধ্যে ইতিহাস চেতনা ও সমাজ চেতনার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবশ্য জীবনী গ্রন্থকে বিদ্যান্ধ সমালোচকেরা দুই ভাগে বিভক্ত করে থাকেন - ১) সাধারণ মানুষের জীবনী (Biography) ও ২) সাধু - সন্তদের জীবনী (Hagiography)। শ্রীচৈতন্যদেব সাধারণ মানুষ ছিলেন না, আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটে তাঁর অলৌকিক জীবন কাহিনি অবলম্বনে মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেবের যে সমস্ত প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার মধ্যে যথেষ্ট অলৌকিকতার পরিচয় থাকলেও সে যুগের সমাজ জীবনের তথ্যপূর্ণ উপাদানেও তা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ভক্তদের দেখে শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন রাধাকৃষ্ণের যুগ্ম অবতার। তাঁর পার্থিব লীলার মধ্য দিয়েই রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব বৃন্দাবন লীলাকে প্রকাশিত হয়ে উঠতে দেখা যায়। সাধারণত বলা হয়ে থাকে বৈষ্ণব পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের রসভাষ্য। চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থগুলি শুধু ভক্তিভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তার মধ্যে কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, সখীতত্ত্ব, সাধ্য-সাধন তত্ত্ব, বৈষ্ণব রস তত্ত্ব, কাম ও প্রেমের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তাই চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ শুধু চৈতন্যজীবনকে জানতে সাহায্য করে না, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসতত্ত্বের পাশাপাশি সমসাময়িক যুগের ইতিহাস অনুধ্যানের পক্ষে তা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলেই তা আমাদের পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১.১ উদ্দেশ্য ঃ

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবিত অবস্থাতেই তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত, সহচর, পরিকরবৃন্দেরা চৈতন্য জীবনী অবলম্বনে সংস্কৃত, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় চৈতন্য চরিত গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত করেছিলেন। মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদর সংস্কৃতে দুটি কড়চা জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন। কবি কর্মপূর্বের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়', 'নাটক', 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্য ও 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা' গ্রন্থ চৈতন্যদেবের জীবন কথা প্রাধান্য পেয়েছে। ওড়িয়া ভাষায় শ্রীচৈতন্য জীবনী গ্রন্থের মধ্যে কানাই খুঁন্টিঘার 'মহাপ্রকাশ', অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতা', ঈশ্বরদাসের 'চৈতন্যভাগবত', মাধর পউনায়কের 'চৈতন্যবিলাম', 'বৈষ্ণবলীলামৃত', দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃত' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যের জীবন কাহিনি অবলম্বনে যে সমস্ত জীবনচরিত বা চরিতকাব্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত কাব্য' -কে কোনো কোনো সমালোক প্রথম গ্রন্থের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। এই শাখার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গ বিজয় কাব্য' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কৃষ্ণদাস রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' কেবল শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থ মাত্র নয়। তার মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসশাস্ত্রের নানা মূল্যবান উপকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণদাস পরিণত বয়সে গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গীতে পূর্বে রচিত গ্রন্থাদি থেকে নানানা তথ্য সংগ্রহ করে তাকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। নানা তথ্য ও তত্ত্বের সংমিশ্রণে রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণ দাস রচনারীতির ক্ষেত্রেও যথেষ্ঠ অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

টিপ্পনী

আলোচ্য প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন, 'তিনি বাংলায় লিপি কুশলতা দেখিয়েছেন তা আধুনিক কালের আগে কোন বাংলা লেখক দেখাতে পারেন নি। বাংলা গদ্য সাবালক হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। কিন্তু তার তিনশ বছর আগে কৃষ্ণদাস পদ্যে যা করেছিলেন তা বংালা গদ্যের সাবালক কালেও যেন অসম্ভব।' এই সমস্ত কারণে কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত' কেবল বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে নয়, সমগ্র বাঙালি পাঠক ও বিদগ্ধ সমাজে গ্রন্থটিকে সসম্মানে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কোন কোন গুনে গ্রন্থটি মধ্যযুগের আধ্যাত্মিক পটভূমিতে রচিত হয়েও আধুনিক যুগের নানা বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা জানার জন্যই চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

টিপ্পনী

১.২ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চৈতন্যচরিতামৃত ঃ

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সংস্কৃত, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় সে যুগে যে সমস্ত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ রচিত হয়েছিল 'চৈতন্যচরিতামৃত' তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনী গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ড. সুকুমার সেন বলেছেন, 'চৈতন্য জীবনী গুলির মধ্যে কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত সবচেয়ে বিস্তৃত আর সবচেয়ে প্রামাণিক। গ্রন্থটির রচনায় লেখকের যে বিচক্ষণতার মর্মজততা ও ইতিহাস চেতনা প্রকটিত তা সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্যে শুধু অদ্বিতীয় নয়, আধুনিক সাহিত্যের গদ্যকারদের কিছুকাল পরেও অপরিকল্পিত।'

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, মধ্যযুগে রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মত তা গেয়ে জনসাধারণকে আনন্দ দেওয়ার জন্য রচিত হয় নি। বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভঙ্গীতে রচিত এই গ্রন্থটি বোদ্ধা পাঠকদের বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে মর্মোদ্ধার করার জন্য তা পরিকল্পিত হয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য যে, চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকার হিসেবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম সুপরিচিত হলেও তাঁর প্রকৃত নাম কৃষ্ণদাস। কবি মুকুন্দকে যেমন মুকুন্দরাম বলে উল্লেখ করা ভিত্তিহীন, ঠিক তেমনি কৃষ্ণদাসের ক্ষেত্রেও তাঁর নামের সঙ্গে কবিরাজ শব্দটি যুক্ত করা উচিত নয়। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন, 'কৃষ্ণদাস গ্রন্থ মধ্যে নিজেকে কখনও ''কবিরাজ'' বলেননি, এবং তা বলবার কথাও নয়। এই উপাধি সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতে নাই। প্রধানত এই উপাধির জন্যই কৃষ্ণদাসের জাতি বৈদ্য স্থির করা হয়েছে। পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। তিনি বাহ্মণও হতে পারেন, কায়স্থও হতে পারেন। কৃষ্ণদাসের নিবাস ছিল আধুনিক বর্ধমান জেলার উত্তর সীমানায় দক্ষিণ তীরের অনতিদূরে ঝামটপুর গ্রামে। এ গ্রাম প্রাচীন এবং কখনও বিদ্যমান। এ গ্রামে কোন বৈদ্যের বসতি এখন নেই এবং পূর্বে কখনও যে ছিল তার প্রমাণ নেই।' তাবে সমালোচকেরা বৈদ্য অর্থে না হলেও কবি শ্রেষ্ঠ (কবিরাজ) হিসেবে এই উপাধি দিলেন কাব্যের ভর্ণিতা অংশে শুধু কৃষ্ণদাস নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন -

শ্রীরূপে - রঘুনাথ - পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।।

তবে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত হওয়ায় কৃষ্ণদাসের নামের সঙ্গে যুক্ত কবিরাজ শব্দটিকে অলঙ্কার হিসেবে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

১.৩ চৈতন্যচরিতামৃতের গঠন, রীতি ও বিষয়বস্তু ঃ

টিপ্পনী

কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি বিভাগকে 'লীলা' শব্দের সঙ্গে যুক্ত কার নাম দেওয়া হয়েছে আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা। প্রত্যেকটি লীলা অংশকে নানা পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আদিলীলায় সতেরো, মধ্যলীলায় পঁচিশ ও অন্ত্যলীলায় কুড়িটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। সর্বমোট পরিচ্ছেদে সংখ্যা বাষট্টি। আদিলীলায় চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের সংকলন পর্যন্ত তাঁর নবদ্বীপ জীবন বা নদীয়া লীলার কথা চলিত হয়েছে। মধ্যলীলায় চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ, রায়দেশ ভ্রমণ, নীলাচলে গমন, সার্বভৌমকে সরতে আনয়ন, দক্ষিণ ভারত যাত্রা। রামানন্দের সঙ্গে রসতত্ত্ব আলোচনায়, দক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, পরে বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে পুনরায় রায় দেশে আগমন, গৌড় থেকে বৃন্দাবন যাত্রা, কাশীতে অবস্থান। বজমন্ডলে আগমন, বৃন্দাবন ধারকে পুরাতন গৌরবে প্রতিক্ষা করা, স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে মিলন এবং নীলাচলে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত নানা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অন্ত্যলীলায় চৈতন্যদেবের জীবনের শেষ আঠারো বছরের কথা রয়েছে। প্রথম থেকে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ভক্তদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের সম্পর্ক, ভক্তদের নীলাচলে আগমন ও তাঁর সঙ্গে মিলনের কথা বর্ণিত হলেও চতুর্দশ পরিচ্ছেদ থেকে বিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত চৈতন্যদেবের দিব্যস্রোমান্মাদনার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক অতুলনীয় গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে একাধারে শ্রীচৈতন্যদেবের অমৃতময় জীবন কথার সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব ও দার্শনিক বিষয়গুলি অত্যন্ত নিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণদাস তাঁর পূর্বসূরী স্বরূপ দামোদর, মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস প্রমুখ চৈতন্য জীবনীকারদের রচনা থেকে যে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে গিয়ে জানিয়েছেন ঃ

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য লীলাসূত্রে লিখিয়াছে বিচারি।।
সেই অনুসারে লিখি লীলা সূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছে তাহা দাসবৃন্দাবন।।

শুধু তাই নয়, ভাগবত, গীতা, বিভিন্ন পুরাণ সহ মোট ষাটটি মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে গ্রন্থ মধ্যে ৬৬২টি শ্লোক ব্যবহার করে তিনি গ্রন্থটির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন প্রতিষ্ঠার জন্য বৃন্দাবনের আচার্য গোস্বামীরা যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তার সার সংগ্রহ করে কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে পরম শ্রদ্ধেয় করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

১.৪ তত্ত্ববস্তু ঃ মধ্যলীলা – অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শুধু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থ নয়। গ্রন্থটিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের

সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব সমূহকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেগুলি হলো - ১) সাধ্যসাধন তত্ত্ব ২) প্রেমবিলাস বিবর্ত ৩) সখীতত্ত্ব।

সাধ্য-সাধন তত্ত্ব - শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণের সময় গোদাবরী নদীর তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। সেই সাক্ষাৎকারের পর তাঁরা দু'জনে নির্জনে মিলিত হয়ে যে সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করেন তাঁর প্রধান বিষয় হলো সাধ্য-সাধন তত্ত্ব।

যে বস্তু লাভের জন্য মানবহৃদয় ব্যাকুল হয়ে থাকে তা হলো সাধ্য আর উপাক্ষের সাহায্যে তা পাওয়া তাকে সাধন বলে। সাধ্য-সাধকের সম্পর্ক হলো উপায় ও উপেয়র। সাধ্য হলো উপেয় আর সাধনা উপেয়। জীবের পুরুষার্থ অর্থাৎ কাব্যবস্তু বা অভীষ্ট হলো সাধ্য এবং তা লাভের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় তাকে সাধনা নামে অভিহিত করা হয়। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' - অর্থাৎ কৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান। তিনি সদু চিৎ ও আনন্দ এই তিনগুণের আধার বলে তাঁকে সচ্চিদানন্দ বলে উল্লেখ করা হয়। তিনি ত্রিগুণাত্মক বা তিনটি গুণের আধার। কৃষ্ণপ্রেমই হলো পরম বৈষ্ণবের আরাধ্য বা সাধ্যবস্তু। শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী বা আহলাদিনী, আনন্দ দায়িনী অর্থাৎ আনন্দাংশ থেকে শ্রীরাধার উৎপত্তি। তিনি হলেন মহাভাব স্বরূপিনী। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার মূল্য উদ্দেশ্য হলো হলাদিনীর সারভূতা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়ে নিজের আনন্দময় রূপকে উপলব্ধি করা। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের গোপীদের ভজনার আশ্রয়ে ভক্তিরসের যে আস্বাদ সৃষ্টি হয় তা বৈষ্ণব ভক্তের কাম্যবস্তু। সেই প্রেমলীলার রস আস্বাদন বা সাধ্যবস্তু বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র শাস্ত্রসম্মত মতানের ভিত্তিতে অনুরাগ শূন্য অবস্থায় ঈশ্বরকে পরম ঈশ্বর্য মতানে ভয় ভক্তিতে উপাসনাকে বলে বৈধীভক্তি আর অন্তরের অনুরাগবশত অন্তরে যে ভক্তির উন্মেষ ঘটে তাকে বলে রাগানুরাগ। বৈধীভক্তি ঈশ্বর উপাসনার প্রথম সোপান হলো স্বধর্মাচরণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতে স্বধর্মাচরণ পরম ধর্ম নয়, কারণ তার মধ্যে পুরুষার্থ নেই। তা রায় রামানন্দকে ভক্তি সাধনার স্তরকে আরো সূক্ষ্ম
ভাবে নির্দেশ করা নির্দেশ দিয়ে বলেন -

'এহো বাহ্য আগে কহ আর।'

তখন রায় রামানন্দ ধারাবাহিকভাবে শ্রীচৈতন্যদেবকে ধর্মাচরণশূন্যভক্তি, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি, জ্ঞানশূন্যভক্তি বা শুদ্ধাভক্তির কথা বলেন। জ্ঞানশূন্যা বা শুদ্ধাভক্তির কথা শুনে শ্রীচৈতন্যদেব বলেন -

এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেম ভক্তি সর্বসাধ্য সার।।

শ্রীচৈতন্যদেবের নির্দেশ রায় রামানন্দ প্রেমভক্তির কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জানান ভক্তের ভক্তি সাধনার ক্ষেত্রে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে ভজনার কথা বলেন। এই পাঁচটি রসের সাহায্যে ভক্তিভাব পরিপুষ্ট হয়ে থাকে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুযায়ী এক একটি রসের গুণ পরবর্তী রসের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রসভেদে ভক্তি সাধনার ক্ষেত্রে তারতম্য লক্ষ করা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন ঃ

ভক্তিভেদে রতিভেদ পঞ্চ প্রচার।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর আর।।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

শান্ত রসের সাধনায় ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্যময় ও শক্তিমান জ্ঞানে তাঁকে ভজনা করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ বা উপপনের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা হলে শান্ত ভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সনক, সনন্দের মত ঋষিরা এই ভক্তিরসের সাধনায় আত্ম নিয়োগ করেছিলেন। দাস্যরসের সাধনায় ভগবান প্রভু আর ভক্ত হলেন দাস। শ্রীমদ্ ভাগবতের উদ্ধব ও বিদূর দাস্যভাবে ভ গবানের সেবা করেছিলেন। সেবা দাসের প্রধানগুণ। বৃন্দাবনে শ্রীদাম-সুদাম প্রমুখ সদ্যরসের সাধনা করেছিলেন। সখ্যতা বা বন্ধুভাব সখ্যরসের অন্যতম গুণ। নন্দ-যশোদা বাৎসল্য রসের সাধনায় কৃষ্ণকে সন্তান স্নেহে লালন-পালন করেছেন। বাৎসল্যরসের সাধনায় স্নেহের সঙ্গে তাড়না-ভর্ৎসনাকে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। স্নেহ বা বৎসলতা বাৎসল্য রসের প্রধান অবলম্বন। মধুর রসের সাধনায় ভগবান দয়িত বা বল্লভ। ভক্তমাত্রেই নারী। এই রসের সাধনায় প্রেমিক ভগবানের সুখ ভক্তের একমাত্র কাব্য। আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে ভক্ত ভগবানকে সুখী করতে চান। তাই প্রেম বা প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের দিক নির্দেশ করে কৃষ্ণদাস বলেছেন ঃ

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছাত্বরে প্রেম নাম।।

মধুর রসের সাধনা আবার দুই ভাগে বিভক্ত স্বকীয়া ও পরকীয়া। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী, রুক্মিনী। সত্যভামা কৃষ্ণের পত্নী হিসেবে স্বকীয়া রূপে কৃষ্ণের আরাধনা করেছে। বৃন্দাবনের গোপিনীরা নারকীয়া বা পরনারী রূপে কৃষ্ণভজনা করায় তাদের নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই স্বকীয়ার চেয়ে পরকীয়া প্রেমের মাধুর্য অনেক বেশী। গোপিনীদের মধ্যে আবার মহাভাব স্বরূপিনী রাধা কৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদনের জন্য আত্মসুখ বিসর্জন দেওয়ায় মধুর রসের সাধনায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছেন। মধুর রসে পূর্বোক্ত বিভিন্ন রসের গুণ সমূহ নিষ্ঠা, সেবা, সখ্যতা, বৎসলতার সঙ্গে মাধুর্য বা মধুর ভাব যুক্ত হওয়া শ্রেষ্ঠ রসের স্থান লাভ করেছে। তবে শ্রীরাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির সারভূতা হওয়ায় একমাত্র তিনি মধুর রসে সাধনার অধিকার লাভ করেছেন। মধুররসের সাধনা বা কান্তা প্রেমকে রায় রামানন্দ সর্বসাধ্য সার বলে উল্লেখ করায় মহাপ্রভু মধুর রসের সাধনাকে 'এহোত্তম' বলে সম্মতিদান করেন। তবে সকলেই মধুর রসের সাধনার অধিকারী না হলেও শ্রীরাধার আনুগত্য স্বীকার করে গোষ্ঠীভাবে রাত্রিদিন রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার মাধুর্য চিন্তা করে দেহমন পরিশুদ্ধ করে রাধারানীর সেবায় আত্ম নিয়োগ করলে রাধা-কৃষ্ণের চরণে আশ্রয় লাভ করতে পারেন। এই পর্যন্ত সাধ্যবস্তুর সীমা আর সাধনার স্তর পরম্পরা রূপে শান্ত, দাস্য, সদ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে সাধনার কথা সাধ্য-সাধন তত্ত্বে বর্ণিত হয়েছে। সাধ্য-সাধনাতত্ত্বের মূল কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কৃষ্ণদাস বলেছেন ঃ

সঙ্গীর স্বভাব এক একম্যকথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সদ্বীয় মন।।
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটী সূত্র পায়।।
নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু, কামের তাৎপর্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য গোদীভাবাবর্ঘ।।
সেই গোদী ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম সর্ব ত্যজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয়।।
রাগানুরাগ মার্গে তারে ভজে যেই জন।

সেই জন পায় বজে বজেন্দ্রনন্দন।।
অতএব গোদীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধা-কৃষ্ণের বিহার।।
সিদ্ধ দেহে চিন্তি করে তাহাই সেবন।
সখীভাবে ন্যায় রাধা কৃষ্ণের চরম।।

প্রেমবিলাস বিবর্ত –

টিপ্পনী

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য ও রায় রামানন্দের সাক্ষাৎকার ও আলোচনা প্রসঙ্গে 'প্রেমবিলাসবিবর্ত' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। রায় রামানন্দ যখন মহামহিমার কথা উল্লেখ করেন তখন তিনি রায় রামানন্দকে বলেন, 'এই হয় আগে কহ আর'। তখন রায় রামানন্দ বলেন –

সেবা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়।।

প্রেমবিলাস শব্দের অর্থ হলো প্রেমলীলা বা প্রেমানন্দ। 'বিবর্ত্ত' শব্দটির অর্থ হলো পরিণাম, পরিপক্ক বা প্রগাঢ় অবস্থা। এই পরিপক্কতার দু'টি লক্ষণ হলো বৈপরীত্য ও ভ্রান্তি। রায় রামানন্দ যখন শ্রীচৈতন্যদেবকে রাধাকৃষ্ণের লীলাকে শ্রেষ্ঠ বলে সাধ্য প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানতে চান প্রথম ভ্রমণ সময় শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে প্রেমবিলাস সম্পর্কে বিস্তৃত রূপে ব্যাখ্যা করতে বলেন। তখন রায় রামানন্দ নিজের লেখা 'পহলহি রাগ নয়নভঙ্গভেল' গানটি গেয়ে শোনান। গানটির 'ন সো রমন না হাম রমনী। / দুহুঁ মন মনোভাব পেষল জানি।।' ইত্যাদি অংশে একই সঙ্গে প্রেমের পরিপক্ক অবস্থা ও বৈপরীত্যের পরিচয় রয়েছে। প্রেমের পরিপূর্ণ বা পরিপক্ক অবস্থায় আত্মপর রহিত জ্ঞানের সৃষ্টি হয় তার ফলে প্রেমবিলাসের তন্ময়তার জন্য নায়ক-নায়িকা নিজেদের পৃথক বলে আর মনে করেন না। প্রেমের পরিপক্কতার জন্যই এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়। 'পহনহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভিন' পদটি কলহান্তরিতা পর্যায়ের। মানের পর পর্যায়ক্রমে প্রণয়, রাগ, অনুরাগ,ভাব ও মহাভাবের উন্মেষ ঘটে। রায় রামানন্দের গাওয়া গানটি মান বা কলহান্তরিতা পর্যায়ের পদ বলে তাতে প্রেমের প্রগাঢ় রূপটি সভাষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই পদটিকে প্রেমবিলাস বিবর্তের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

সখীতত্ত্ব – কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে সখীতত্ত্বের অবতারণা করেছেন। সেখানে রাধাকৃষ্ণ লীলার রস পরিপুষ্টির জন্য তিনি সখীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। সখীদের সাহায্যে ই রাধাকৃষ্ণ লীলারূপ সাধ্যবস্তু কী ভাবে পাওয়া সম্ভব তার ইঙ্গিত দিয়ে কৃষ্ণদাস বলেছেন ঃ

সখীভাবে তাহা যেই করে অনুগতি।
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।।

সখী ভাবের অনুগত হয়ে রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কথা চিন্তা করলে ভক্ত সিদ্ধদেহ লাভ করে সখীভাবে রাধাকৃষ্ণের ধরণে আশ্রয় লাভ করেন। চৈতন্যচরিতামৃতের অনুসরণে বলা যায় ঃ

সচ্চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ।।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
বিদংশে সংবিদ যাবে জ্ঞানে করি মানি।।
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।।
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী।।

টিপ্পনী

১.৫ চৈতন্যচরিতামৃত – মধ্যলীলা : অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী বা হলাদিনী শক্তি থেকে শ্রীরাধার জন্ম। তিনি মহাভাব স্বরূপিনী। তাই রাধাকৃষ্ণ প্রেমের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে রাধা-কৃষ্ণ লীলার মধ্য দিয়ে। শ্রীরাধার প্রেমে লৌকিক নায়িকার আভাস থাকলেও তা লোকোত্তর মহিমা লাভ করেছে। কৃষ্ণদাস লৌকিক কাম প্রবৃত্তি ও লোকাতীত প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যেছে স্বরূপে বিলষণ।।
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা হলো কাম। তার সাহায্যে ইন্দ্রিয়ের জৈবিক পরিতৃপ্তি সাধিত হয়, কিন্তু প্রেম লোকোত্তর বলে তা কৃষ্ণমুখী বা ভগবান মুখী। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদনের জন্য শ্রীরাধার সৃষ্টি বলে কৃষ্ণ শতকোটি গোপীর সঙ্গে রাসলীলা করা সত্তেও তৃপ্ত হন- নি। শ্রীরাধা অভিমানে রাসস্থলী ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় কৃষ্ণ যেভাবে তাঁকে খুঁজতে যান তার মধ্যে রাধা প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব বা সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই ঘটনার ইঙ্গিত দিয়ে কৃষ্ণদাস বলেছেনঃ

শতকোটি গোপী সঙ্গে রাস বিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তে রহে রাধা পাশ।।
সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা।।
ক্রোধি করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখি ইহাঁ ব্যাকুল হৈলা হরি।।

চৈতন্যচরিতামৃত – মধ্যলীলা ঃ অষ্টম পরিচ্ছেদ

তার কারণ হলো শ্রীরাধা মহাভাব স্বরূপিনী বলে তিনি হলেন গোপী শ্রেষ্ঠা। গোপী শব্দটির উৎপত্তি 'গুপ্' ধাতু থেকে। গুপ শব্দের অর্থ হলো রষা করা। যে সমস্ত নারী শ্রীকৃষ্ণের বশীকরণযোগ্য প্রেম রক্ষা করেন তাঁদের বলা হয় গোপী। স্বয়ংভগবান কৃষ্ণ প্রেমের বশীভূত। কিন্তু গোপীদের প্রেম আত্ম সন্তুষ্টির জন্য নয়, কৃষ্ণকে আনন্দদান করাই তাঁদের লক্ষ। গোপীদের মধ্যে রাধা প্রেমের শ্রেষ্ঠথ্যের কারণ হলো তাঁর প্রেমের মধ্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি পরকীয়া প্রেমের

আধারে মূর্ত হয়ে উঠেছে। গোপীরা রাধার কায়ব্যুহ রূপে রাধার কৃষ্ণেন্দ্রিয় স্ত্রীবি বাঞ্ছাকে রক্ষা করেন। রাধাকৃষ্ণ লীলায় সখীর বা গোপীদের ভূমিকা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে কৃষ্ণদাস বলেছেন ঃ

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখীরমন।।
কৃষ্ণসহ রাধিকার যে লীলা করায়।
নিজ কেলি হইতে তাহে কোটি সুখ দায়।।

টিপ্পনী

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ঃ অষ্টম পরিচ্ছেদ

তাই বৃন্দাবনের রাধা কৃষ্ণ লীলায় সখীদের গুরুত্ব সম্পর্কে কৃষ্ণদাস বলেছেন ঃ

রাধার স্বরূপ - কৃষ্ণ প্রেম কাল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা।।
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিন্নচয়।
নিজ সেক হইতেপলবাদ্যের কোটি সুখ হয়।।

চৈতন্যচরিতামৃত - মধ্যলীলা ঃ অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাধা প্রেমের মধ্য দিয়ে প্রকৃত অর্থে গোপীদের কামগন্ধহীন প্রেমের সার্থকতার পরিচয় সচাষ্ট হয়ে ওঠার গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে সখীতত্ত্বকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১.৬ রায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকার ঃ

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যদেব কিছু দিন নীলাচলে অবস্থানের পর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময় বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করেন। জিয়ড়ে উপস্থিত হয়ে নৃসিংহ ক্ষেত্র দর্শকের পর পথে বহু নর-নারীকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করার পর তিনি গোদাবরী নদীর তীরে এসে উপস্থিত হন। স্নান সেরে তিনি সেখানে যখন কৃষ্ণ নাম সংকীর্তনে রত এমন সময় সেখানে দোলায় চড়ে রায় রামানন্দ এসে উপস্থিত হন। তিনি ছিলেন রাজা প্রতাপরুদ্রের অমাত্য এবং বিদ্যানগরের শাসনকর্তা। শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যকান্তি দেখে বিস্মিত হয়ে রায় রামানন্দ মহাপ্রভূকে দন্ডবৎ হয়ে প্রমাণ করলেন প্রভুর নির্দেশে উঠে দাঁড়ানোর পর তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করেন। রায় রামানন্দ ছিলেন জাতিতে শূদ্র। চৈতন্যদেব তাঁকে পরম স্নেহে আলিঙ্গন করায় রামানন্দে অনুচর বৈদিক বাহ্মণেরা বিস্মত হয়ে পড়েন। রামানন্দ মহাপ্রভুকে চিনতে পেরে বলেন ঃ

কাঁহা তুমি ঈশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধর।।

রামানন্দের অনুরোধে মহাপ্রভু এক বৈদিক বাহ্মণের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রতি সন্ধ্যায় রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর কাছে এসে নানা আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। নির্জন জায়গায় রামানন্দের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব আলোচনা করেন। এই আলোচনায় শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন প্রশ্ন কর্তা আর রায় রামানন্দ উত্তর দাতা। শ্রীচৈতন্যদেব রায় রামানন্দ

টিপ্পনী

'সাধ্যবাস্তবিক তাহা নির্ণয় কর' ।রায় রামানন্দ একে একে স্বধর্মাচরণ, কৃষ্ণে কর্ম অর্পণ, স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রভক্তি ও জ্ঞানশূন্যভক্তিকে সর্বসাধ্যসার বলে উল্লেখে করায় প্রত্যেকটি বিষয়ের কথা শুনে চৈতন্যদেব 'এহো বাহ্য আগে কহ আর' বলে রামানন্দকে প্রেমভক্তির গূঢ় বিষয়টি নির্দেশ করতে বলেন। মহাপ্রভু তাতেও সন্তুষ্ট না হওয়ায় রামানন্দ বৈধীভক্তির পথ অতিক্রম করে যখন রাগানুরাগ ভক্তির কথা বলেন তখন শ্রীচৈতন্যদেব 'এহো হয় বলে' সম্মতি জানিয়ে তা আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করতে বলেন। রায় রামানন্দ তখন শান্ত, দাস্য, সন্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসের কথা আলোচনা করে বলেন, 'কান্তাপ্রেম সর্ব সাধ্য সার'। তখন শ্রীচৈতন্যদেব রাধা প্রেমের উৎকর্ষের কথা জানতে চাওয়ায় রায় রামানন্দ তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রসতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে শোনান। 'প্রেমবিলাস বির্বত' সম্পর্কে আলোচনা কালে রায় রামানন্দ স্বরচিত গান 'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল' শোনাতে গেলে মহাপ্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ বন্ধ করে দেন। রায় রামানন্দের মন থেকে সাধ্যবস্তু সম্পর্কে জানার পর শ্রীচৈতন্যদেব সাধ্য রস প্রাপ্তির উপায় জানতে চাওয়ায় তিনি রাগানুরাগ ভক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

রাগানুরাগ মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় বজে বজেন্দ্র-নন্দন।।

শ্রীচৈতন্যদেবের অনুরোধে রায় রামানন্দ ধর্মালোচনায় আরো কয়েকটি দিন তাঁর সঙ্গে কাটান।গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব রায় রামানন্দ চৈতন্যের সাক্ষাৎকারের ব্যাখ্যাত হওয়ায় প্রসঙ্গটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৭ কৃষ্ণদাস কবিরাজের কবি প্রতিভা ঃ

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যচরিতামৃত শুধু শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ জীবনী কাব্য নয়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ সৃষ্টি। ভক্ত বৈষ্ণব ও নানা শাস্ত্রে সুপন্ডিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যজীবনী রচনায় অসাধারণ দক্ষতার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। বৃন্দাবনের আচার্যেরা সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত অমূল্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে তার সার সঙ্কলন করে একাধারে চৈতন্য জীবনী ও চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের তাত্ত্বিক দিকটিকে সৃষ্টি করে তুলেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছে মোস্ত্রাদি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।তাই তিনি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আচার্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন ঃ

শ্রীরূপ সনাতন ভঙ্গ রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ।।
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁ সভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।।

ছয় গোস্বামীর সাহচর্যে কৃষ্ণদাস অসাধারণ পান্ডিত্য, দার্শনিক, গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গী ও কবিত্বশক্তি লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। আঠার বছরের সুদীর্ঘ পরিশ্রমে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তিনি স্বরূপ দামোদর, মুরারি

গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস প্রমুখ চৈতন্য জীবনীকারদের গ্রন্থ সাহায্য হিসেবে গ্রহণ করে কাব্যগ্রন্থটি রচনা করার জন্য তিনি পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে জানিয়েছেন ঃ

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি।।
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।
বিস্তারি বর্নিয়াছে তাহা দাস বৃন্দাবন।।
চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ।।

টিপ্পনী

কৃষ্ণদাস কবিরাজের আগে রচিত বৃন্দাবন দাস দাসের চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। এক অখন্ড গবেষক সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহন করেছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনার এই অভিনবত্বের দিকটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন ঃ

গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে তিঁহো ছাড়িলা যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে।।
প্রভুর লীলামৃত তিঁহো কেল আস্বাদন।
তার ভুক্ত শেষ কিছু করিয়ে চর্বন।।

বিনয়বশত কৃষ্ণদাস ভুক্তাবশেষ চর্বনের কথা বললেও তাঁর গ্রন্থটি কোনো মতেই চর্বিতচর্বন নয়। বরং বহু ক্ষেত্রে তিনি অগ্রগণ্য বৈষ্ণব তাত্ত্বিক ও দার্শনিকেরা ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, বৃদ্ধ বয়সে দুর্বল শরীরে গ্রন্থ রচনা করলেও গ্রন্থটির মধ্যে কোনো ত্রুটি বা দুর্বলতার পরিচয় নেই। তবু তিনি বিনয়ের সঙ্গে জানিয়েছিলেন ঃ

বৃদ্ধ জরাতুর আরি অশ্ব বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির।।
নানা রোগ গ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগের পীড়ায় রাত্রি দিনে মরি।।

কৃষ্ণদাস সংস্কৃত ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত রচনার আগে সংস্কৃত ভাষায় 'গোবিন্দলীলামৃত' ও 'সারঙ্গরঙ্গদা' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তবে চৈতন্যচরিতামৃত রচনার আগে বাংলায় তিনি কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। কৃষ্ণদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শনের আধার রূপে 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্য রচনা করলেও গ্রন্থটিতে তাঁর কবিপ্রতিভার যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে। তিনি পয়ার ও ত্রিপদী উভয় রীতিতে কাব্যরচনায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এই দুই ছন্দরীতির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় ঃ

১) সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।।
হ্লাদিনীর সার অংশ - তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস - প্রেমের আস্তান।।
প্রেমের পরম সার 'মহাভাব' জানি।

সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরানী।। (পয়ার ছন্দ)

মধ্যলীল ঃ অষ্টম পরিচ্ছেদ

২) আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাম্পয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে
তবু লিখি এ বড় বিস্ময়।

টিপ্পনী

মধ্যলীলা ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (ত্রিপদী)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ অলঙ্কার ব্যবহারের যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন –

১) কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগৌ না লুকায় অন্যদাগে
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু।।

২) মুক্তি-ভক্তি-বাঞ্ছা যেই কাঁহা দোহার গতি?
স্থাবর দেহে দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি।।
অরসজত কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে। রসজ্ঞ
কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে।।

পূর্ব সূচীদের রচিত গ্রন্থ ছাড়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কৃষ্ণদাস অনুসন্ধিৎসু গবেষকের মত শ্রীমদ্‌ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, গীতা, উম্বলনীলনণি, বহ্মসংহিতা, ভক্তিরমামৃত সিন্ধু ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার মধ্যে যথেষ্ঠ পান্ডিত্যের পরিচয় লুকিয়ে রয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কবি প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ড. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'গদ্যভাষা ছাড়া ছন্দে দার্শনিক তত্ত্বালোচনা অতিশয় দুরূহে, আধুনিক ভাষায় প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। কবিরাজ অতিশয় দুরূহ কর্মে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।' তাছাড়া কবিত্ব, সৌন্দর্য, মাধুর্য ও রচনার অভিনবত্বের জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতের নানা পংক্তি প্রবাদপ্রতিম কাব্য বা Epigram হিসেবে এ যুগেও লোকমুখে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন –

i) এহো বাহ্য আগে কহ আর।

ii) আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।

iii) কার প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যেছে স্বরূপে বিলক্ষণ।।

iv) আরযজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।

রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে।। ইত্যাদি।

বিষয় বস্তুর মধ্যে ভাবগভীরতা, দার্শনিক তত্ত্ব বস্তুর সংমিশ্রণ, ছন্দ-অলঙ্কারের প্রয়োগ, প্রবাদবাক্যের ব্যবহার ও সুনিপুণ গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি রচনা করায় কোথায় তা ভারগ্রস্ত হয়ে ওঠেনি বরং তাঁর অসাধারণ কাব্য প্রতিভার গুণে গ্রন্থটি স্বাদু ও সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

১.৮ আত্মমূল্যায় ধর্মী প্রশ্ন ঃ

টিপ্পনী

১) রায় রামানন্দ কে ছিলেন?

২) রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন?

৩) বৈধীভক্তি ও রাগানুরাগ ভক্তির মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

৪) র কয় প্রকার ও কি কি ?

৫) 'এহো বাহ্য আগে কহ আর' কথাটি কে কেন বলেছিলেন?

১.৯ উত্তর লিখে পাঠাবার জন্য প্রশ্নাবলী ঃ

১) চৈতন্য জীবনী সাহিত্যের পরিচয় দিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২) চৈতন্যচরিতামৃতের গঠনরীতি ও বিষয়বস্তুর পরিচয় দিন।

৩) চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪) সাধ্য সাধন তত্ত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫) 'প্রেমবিলাস বিবর্ত' সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬) রায় রামানন্দ ও চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকার বর্ণনা করুন।

৭) সখীতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৮) চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজের কবি প্রতিভার পরিচয় দিন।

১.১০ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১) চৈতন্যচরিতামৃত (লঘু সংকরণ) সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি।

২) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩) চৈতন্যচরিতামৃত (আলোচনা) সুখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়।

৪) চৈতন্যচরিতামৃত - সম্পাদনা - অশোক চট্টোপাধ্যায়।

৫) বৈষ্ণব সাহিত্য – ত্রিপুরা শঙ্কর সেন শাস্ত্রী।

৬) চৈতন্য চরিতের উপাদান – বিমান বিহারী মজুমদার।

৭) বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম – রমাকান্ত চক্রবর্তী।

৮) বৃহৎবঙ্গ – দীনেশচন্দ্র সেন।

টিপ্পনী

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদরত্নাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারসম্পাদিত

টিপ্পনী

২.০ ভূমিকা

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ পদরত্নাবলীর পরিচয়

২.৩ পদরত্নাবলীর বৈশিষ্ট্য

২.৪ রবীন্দ্রনাথ ঃ বৈষ্ণব পদাবলী ও পদরত্নাবলী

২.৫ পদরত্নাবলীর বিন্যাস পদ্ধতি

২.৬ দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা

২.৭ বিরহ মিলনের মানস রাজ্য

২.৮ শেষে গৌরাঙ্গ বিষয় কবিতা বসানোর কারণ

২.৯ লিরিকে ভঙ্গী ও ভাষা

২.১০ রবীন্দ্র সুবাসিত বৈষ্ণব কবিতা

২.১১ আতমূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্ন

২.১২ উত্তর লিখে পাঠানোর জন্য প্রশ্নাবলী

২.১৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

২.০ ভূমিকা

মধ্যযুগের বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের আর্বিভাব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের ফলে কীর্তনগান জনপ্রিয়তা লাভ করায় সে যুগে প্রবাদ বাক্য হিসাবে শোনা যেত কানু ছাড়া গীত নেই। অবশ্য এ যুগে প্রবাদ বাক্যটি তার ঐতিহাসিক প্রামান্যতা হারিয়ে শুধু গতানুগতিক তার ইঙ্গিতে পর্যবসিত হয়েছে। তবু আমরা বলতে পারি কীর্তনগানের জনপ্রিয়তার জন্যই 'বৈষ্ণবপদাবলী সংকলনের' কাজ ত্বরান্বিত হয়েছিল। পুরাতন যুগে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য

'বৈষ্ণব পদ সংকলন' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে ক্ষনাদাগীত চিন্তামনি শ্রীশ্রী পদকল্পতরু পদামৃত সমুদ্র পদকলা লতিকা ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত পাঁচশত বৎসরের পদাবলী সুকুমার সেন বিশ্বস্পতি চৌধুরী শ্যামপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বৈষ্ণবপদাবলী' সুকুমার সেন সঙ্কলিত বৈষ্ণব পদাবলী দেবনাথ বন্ধ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণবপদ সঙ্কলন' প্রভৃতির কথা মনে রেখে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থের মূল্যায়ন করতে হবে।

টিপ্পনী

২.১ উদ্দেশ্য

বৈষ্ণব পদাবলী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা। মধ্যযুগের সাহিত্য সব দেশেই দেব নির্ভর (Theocentric) সাহিত্য যে ভাবে গড়ে উঠেছে বৈষ্ণব পদাবলীতেও তার প্রভাব রয়েছে। তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রধান আরাধিকা শ্রীরাধাকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব পদাবলীতে যে প্রেমভক্তির ধারা প্রবাহিত হয়েছে তার মধ্যে আধুনিক যুগের মানব নির্ভর (Anthropocentric) সাহিত্য সৃষ্টের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসন্য ও মধুর এই পঞ্চরসের উপর বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের রস সৌধ নির্মিত হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে শ্রীরাধার প্রেম সর্ব সাধ্যসার বলে বিবেচিত জক্তিয়ায় রাধা কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার পটভূমিতে রচিত মধুর রসের প্রেমকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রে বলা হয়েছে এক একটি রসের গুন পরবর্তী রসগুলির ঔপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মধুর রসে সর্বাধিক গুনের পারয়ি থাকায় তা অনিবার্য ভাবে শ্রেষ্টত্বের অধিকারি হয়ে উঠেছে । বিষয়টিকে বিশ্লেষন করলে এভাবে বলা যায় বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রে বর্নিত পাঁচটি রসের গুন হলো শান্তের নিষ্টা, দাস্যের সেবা , সখ্যের বন্ধুত্ব বা সখ্যতা বাৎসল্যের স্নেহ বা বৎসলতা ও মধুর রসের মাধুর্য ভাব বা একানতা প্রতিটি রসের গুন পরের রসের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যে অবস্থা দাঁড়ায় তাহলো ১) শান্তের ১টি গুন নিষ্ঠা ২) দাস্যের ২টি গুননিষ্ঠা ও সেবা ৩) সখ্যের ৩টি গুন নিষ্ঠাসেবা বন্ধুত্ব বা সখ্যতা ৪) বাৎসল্যের ৪টি গুন নিষ্ঠা সেবা সখ্যতা বৎসলতা আর ৫) মধুর রসের ৫টি গুন নিষ্ঠা সেবা সখ্যতা বৎসলতা ও একাত্নতা। তাই পাঁচটি রসের ৫টি গুন মধুর ভাবের সাধনায় একন্ত্রিত হওয়ায় তাকে শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

মধ্যযুগের রীতি অনুযায়ী বৈষ্ণব পদকর্তারা বৈষ্ণব পদাবলীতে ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কে ত্বাধ্যাত্নিকতা মন্ডিত করে তুলেছেন। কিন্তু ভক্ত ভগবানের সেই সম্পর্কে মানবিক সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রাধা কৃষ্ণের অলৌকিক বৃন্দাবন লীলা বৈষ্ণব পদাবলীর মূল উপজীব্য বিষয় হলেও তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নর নারীর লৌকিক জীবনের উপর ভিত্তি করে। তাই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য অধ্যাত্বিক হয়েও লৌকিক প্রেমের সার্থক উদাহরণ হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত পদরত্নাবলী সংকলন গ্রন্থাটির সূচনায় তাই বলা হয়েছে।

পদরত্নাবলীই মহাজন পদাবলীর সর্ব প্রথম সংকলন যাহা বৈষ্ণব ধর্মের সাধন ভজনের অঙ্গ হিসাবে শিথিত হয় নাই। বিশুদ্ধ সাহিত্যরস পরিবেশন করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও মনে করতেন শুধু বৈকুশৌর তার বৈষ্ণবের গান নয়। তাই রাধা কৃষ্ণের ভক্ত ভগবান সম্পর্কের আধ্যাত্নক সীমাকে আতিক্রম এই গ্রন্থের সন্নিবেশিত পদগুলিতে রাধা

কৃষ্ণের মানব লীলা ও রসানুভূতিকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতিতে পদরত্নাবলীর পর্যায় গুনি পূর্বরাগ, অনুরাগ, ত্বাষেণপানুরাগ, অভিসার মান মানযুর, ভাবোল্লাস মিলন ইত্যাদি ক্রম অনুযায়ী না সাজিয়ে মানব প্রেমের উন্মীলনকে সম্পষ্ট করার জন্য রাধা কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাকে প্রেমের প্রকাশের উপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তাই গৌরচন্দ্রিকা বা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদকে প্রাধান্য না দিয়ে ক্রমটিকে বজায় রেখেই গৌরচন্দ্রিকা বা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদকে শেষে বিন্যস্ত করে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে রাধা কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাকে শ্রীচৈতন্য দেব তাঁর ভাব সাধনার মধ্য দিয়ে মূর্ত করে তুলেছিলেন। পদরত্নাবলী গ্রন্থের সংকলক দের এই অভিস্রায়ের কথা মনে রেখে বৈষ্ণব পদাবলী যে আধ্যাত্বিক হলেও লৌকিক বা মানবিক একথা মনে রেখেই আমাদের আলোচ্যগ্রন্থের অন্তর্গত পদ গুলির রস গ্রহণ করতে হবে।

টিপ্পনী

২.২ পদরত্নাবলীর পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলীর সংকলনগ্রন্থ পদরত্নাবলী র প্রাথমিক ক্ষুদ্র সংকরণটি ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮১। গ্রন্থটির নিবেদন অংশে রবীন্দ্রনাথ মহাজন পদাবলীর সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা গুলি ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে নানাত্রুটি ও অসম্পূর্না লক্ষ করে তাতে শতাধিক পদ যুক্ত করে সংশোধিত সংসকরণ প্রকাশ করেন। ১২৯২ বঙ্গাব্দের ১২ আষাঢ় তা প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্র নিবেদন সূচীপত্র ভূমিকা এবং ১১০ টি পদ নিয়ে তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৩৮। রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক ২৭ টি নতুন পদ দ্বিতীয় সংস্করণে গৃহীত হলেও সূচীপত্রে ২৩ টি পদের উল্লেখ রয়েছে। ৪টির পদ পড়েছে। আমাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত পদরত্নাবলী আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড কতৃত প্রকাশিত। তাতে মূল অংশে ২৫৭ টি ও পরিশিষ্ঠে ৪টি বাদ সংকলিত হয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের করা বিভিন্ন বৈষ্ণব পদকর্তরা ১৫টি পদের ইংরেজি অনুবাদ। বিভিন্ন সংস্করনের পরিবর্তন পরিবর্ধন পরিমার্জন সহ প্রাসঙ্গিক নানা তথ্যের সঙ্গে বর্তমান সংকলনে আচার্য নন্দলাল বসুর আঁকা ৪টি ও অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের আঁকা ১টি মোট ৫টি ছবি গ্রন্থটির সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করেছে।

২.৩ পদরত্নাবলীর বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন সময়ে ক্ষনদাগীত চিন্তামনি শ্রীশ্রী পদকল্পতরু পদমৃত সমুদ্র পদকল্পলতিকা জাতীয় নানা বৈষ্ণবপদ সংকলন প্রকাশিত হলেও অন্যান্য সংকলন গ্রন্থগুলির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় পদরত্নাবলী গ্রন্থের মধ্যে নানা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রয়েছে। যেমন –

১। 'পদরত্নাবলীর' পূর্বে প্রকাশিত সংকলন গুলিতে গৌড়িয় বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বৈষ্ণব পদসংকলন পদরত্নাবলী তে আধ্যাতিকতা নয়, সাহিত্য রস ও সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

২। অন্যান্য বৈষ্ণব পদ সংকলনে বৈষ্ণব রস শাস্ত্র অনুযায়ী রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার

উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের রুপটিকে অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রদত্ত সংজতা অনুযায়ী পূর্বরাগ অনুরাগ অভিসার, মাথুর ভাব সম্মিলন ইত্যাদি রস পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হলেও আলোচ্য সংকলনে অলঙ্কার শাস্ত্র সম্মত ভাবে রাধা কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাকে নানা রস পর্যায়ে বিভক্ত না করে লৌকিক প্রেমের ক্ষেত্রে নর নারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষন যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে বিরহ মিলন পূর্ন প্রেমের গতিপথ ধরে সমাপ্তির দিক এগিয়ে যায় তার উপরে প্রাধান্য দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রেম বা ভক্তিকে মানবিক করে তোলা হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কোথায় সূহলতা বা কুরুচির পরিচয় নেই।

টিপ্পনী

৩। বৈষ্ণব রস শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী বিশেষত খেতুরী মহোৎসবের পর পালাবদ্ধ কীর্তন গানের আগে গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক পদগুলি পরিবেশনের রীতি গৃহীত হওয়ায় বৈষ্ণব পদ সংকলন গুলিতে বৃন্দাবন লীলার আগে গৌরচকিা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদকে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই জাতীয় পদ চৈতন্য আবির্ভাবের পর রচিত বলে রবীন্দ্রনাথ রাধা ভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বনে রচিত এই জাতীয় পদকে পদরত্নাবলী তে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুযায়ী শেষে যুক্ত করা হয়েছে।

৪। নর নারীর সমস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায় বর্তমান সংকলনে রাধা কৃষ্ণের প্রেম মনস্তসের বিকাশে প্রকৃতির ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়ে অন রুপ পদগুচ্ছকে বিশেষ ভাবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

৫। অন্যান্য বৈষ্ণবপদ সংকলনের মত পদরত্নাবলী কে টীকা টিপ্পনীতে কন্টকিত করে না তোলায় তা পাঠকের কাছে পদ আস্যাদনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেনি। নিজের বুদ্ধিবৃত্তির সা হায্যে তারা সমৃদ্ধে রস গ্রহনের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

৬। প্রথম সংস্করনের পদ বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে অসঙ্গতি ছিল রবীন্দ্রনাথের সযত্ন প্রয়াসে তা দূর করার চেষ্টা হলেও পরিমার্জিত আষাঢ় সংস্করনেও তা সম্পূর্ন দূর না হওয়ার রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে নিবেদন অংশে জানিয়ে ছিলেন –

যে ক্রমানুসারে কবিতা গুলি বসাইবার কথা ছিল দুর্ভাগ্যক্রমে আগাগোড়া তাহা রক্ষিত হইতে পায় নাই কেননা অনবধানতা বশত কতকগুলি কবিতা সময়ে যথা স্থানে নিবেশিত হয় নাই। রাধাকৃষ্ণ সমস্ত কবিতা শৃঙ্খলা মত বসাইয়া শেষে গৌরাঙ্গ বিষয়ক কবিতা বসাইবার পরিকল্পনা ছিল ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিস্পিত্ত রুপে পদরত্নাবলীকে সাজিয়ে তুলতে পারেননি। আলোচ্য পদরত্নাবলীর আনন্দ সংস্করনে সবশেষে ২৫২ থেকে ২৫৭সংখ্যক পদে সব শেষেই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলি যুক্ত করে সংকলনটিকে রবীন্দ্রভাবনার অভিমুখি করে তোলা হয়েছে।

৭। 'পদরত্নাবলী'র সংকলিত পদগুলিতে সংলাপধর্মিতাকে প্রধান্য দেওয়ায় তার মধ্যে নাটকীয় দ্বন্ধের সঙ্গে উৎকণ্ঠা (Conflict & Suspense) র পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।

৮। 'পদরত্নাবলী'র নিবেদন অংশে সংকলিত পদগুলিকে রবীন্দ্রনাথ কবিতা বলে উল্লেখ করেছেন । তার ফলে মধ্য যুগে রচিত বৈষ্ণব পদকর্তাদের আধ্যাত্মিক ভাবের পদ রামাগুলিতে রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসারী হয়ে কাব্য সৌন্দর্যের পাঠক খুব সহজেই কাব্য সৌন্দর্যের সন্ধান পেতে সক্ষম হয়েছেন ।

২.৪ রবীন্দ্রনাথ ঃ বৈষ্ণবপদাবলী ও পদরত্নাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত পদরত্নাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব পদাবলী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষনের বিষয়টি অবশ্য আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে । বৈষ্ণবপদ সংকলন রবীন্দ্রনাথের জীবনে কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। আবাল্য বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি তাঁর আগ্রহ আকর্ষন এই জাতীয় সংকলন প্রর্বয়নে কী ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন সে কথা আমাদের জানা দরকার। রবীন্দ্র মননের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ত্রিপুরাশঙ্কর শাস্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন।

টিপ্পনী

> রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপানিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত কিন্তু বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী ভাবনা, বৈষ্ণবের প্রেমধর্মে ও বাউলের মানব ধর্ম্ম তাঁহার কবি মানসকে পরিপৃষ্ঠ করিয়াছিল।

অত্যন্ত বাল্যকালে পারিবারিক পরিবেশে মধ্যেযুগের সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । সে ক্ষেত্রে শ্রীকণ্ঠ সিংহের কাছে সংগীত চর্চার সম্পৃতি বিবৃত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন

> গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠ বাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। তাঁর একটা প্রিয় গান ছিল ময় ছোঁড়ো বজ কি বাসরী ঐ গানটি সংকলকে শোনাইনর জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন ।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের প্রিয় বন্ধু অক্ষয় চৌধুরীর সান্নিধ্যে এ সে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাল্যে পিতৃ দেবের সঙ্গে গঙ্গার পশ্চিম তীরে ভ্রমনের সময় বোটের দেরাজে অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে থাকা ডঃ হেবার্লিন সংকলিত জয়দেবের গীত গোবিন্দ কাব্য বালক রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল। অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বিদ্যাপতির অনুরাগী। দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির পদ ও বজবুলি ভাষা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। বৈষ্ণবপদাবলীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষনের কথা জানিয়ে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন ঃ

> রাধা যেমন বাঁশির তান শুনে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথও তেমনি কবিতার ছন্দের টানে পড়েই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব গৃহস্থ বংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই বংশের সকলকেই বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হত। ঠাকুর পরিবারের অন্তপুরিকাদের স্ত্রী শিক্ষার দায়িত্বে ছিলেন বৈষ্ণব আচার্যা বা মা গোঁইয়েরা পারিবারিক পরিমন্ডলের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবপদাবলী চর্চার যে সূত্রপাত ঘটেছিল তা পরবর্তী কালে আরো গভীর হয়ে ওঠে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি চ্যাটারটন যেমন পুরাতন ইংরেজি ভাষা ও ছন্দরীতি অবশশ্বনে কবিতা রচনা করে তা 'ওশিয়ান' নামক আইরিনা কবির রচনা বলে প্রকাশ করেছে দেশের কাব্য মোদী মহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেন রবীন্দ্রনাথ ও তেমনি ভারতী পত্রিকা ভানুসিংহ ছন্দনামে বজবুলি ভাষা ভানুসিংহের পদাবলী প্রকাশ করে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি তাঁর আগ্রহের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এখানেই রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব পদাবলী চর্চার সমাপ্তি ঘটেনি।

টিপ্পনী

'পদরত্নাবলী' গ্রন্থে প্রসঙ্গ অংশে জানানো হয়েছে ঃ

> রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগের অন্যতর দৃষ্টান্ত , এই কালে (১২৯২-১৩০২। বঙ্গাঁব্দে) অন্তত চার বার বৈষ্ণব পদ সংকলন প্রচেষ্টা।এগুলির মধ্যে প্রথম প্রচেষ্টা পদরত্নাবলী গ্রন্থে প্রকাশ (১২৯২বঙ্গাঁব্দ) ব্যতীত বাকি সকল প্রয়াস নানা কারণে অসফল হয়। পরিণত বয়সেও যে সকল প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, সেগুলিও যৌবন কালের একাধিক চেষ্টাগুলির মতোই পূর্ণতা লাভ করে নাই।

বৈষ্ণব পদাবলী সংকলনে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উদ্যোগ ছিল শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় পদরত্নাবলী গ্রন্থের প্রকাশ। সেটাই ছিল প্রথম ও শেষ সার্থক প্রয়াস। প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি রচিত পদের রসাস্বাদন করেছিলেন। তাই বিভিন্ন সময়ে তিনি বিদ্যাপতির পদ সংকলনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেও তা ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ গ্রন্থে বিদ্যাপতির পদ সংকলনে নানা ত্রুটি লক্ষ করে তিনি পদরত্নাবলী প্রকাশের পর বিদ্যাপতির প্রধান্য সংকলন প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে নানা বিজপ্তি প্রকাশিত হলেও গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করেনি। তার পর রবীন্দ্রনাথ বষ্ঠীয় সাহিত্য পরিষদের অনুরোধে বিদ্যাপতির পদ সংকলনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেও প্রয়োজনীয় প্রাচীন পুঁথি ও তথ্যাদি সংগ্রহ করতে না পারায় এই উদ্যোগটিও ব্যর্থ হয়ে যায়। বিদ্যাপতির পদ সংকলনের ইচ্ছা ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্রমানিক্যের পৃষ্ট পোষকতায় প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে বৈষ্ণব পদ সংকলনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেও বীরাচন্দ্রমানিক্যের অকাল প্রয়ানে এই উদ্যোগ বাতিল হয়ে যায়। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর গৃহপাঠ্য সংস্করণ প্রকাশে উৎসাহী হয়েছিলেন। এ গ্রন্থটিও বিজপিত হয়েও আত্মপ্রকাশ করেনি। রবীন্দ্রনাথ যৌবন থেকে প্রিয়া বয়স পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলীর নানা সংকলন গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী ও উৎসাহী হলেও কার্যত তা সাফল্য মন্ডিত হয়ে ওঠেনি নানা ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য পদরত্নাবলীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরুপ মনোভাব থাকলেও স্বহস্তে পরিমার্জিত পদরত্নাবলীর সংশোধিত সংস্করণই রবীন্দ্রস্মৃতি জড়িত একমাত্র বৈষ্ণব পদ সংকলন রুপে আমরা পেয়েছি। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের পদরত্নাবলীর প্রকাশ ও অন্যান্য ব্যর্থ উদ্যোগের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক আকর্ষনের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

২.৫ পদরত্নাবলীর বিন্যাস পদ্ধতি

'পদরত্নাবলী' - সংকলনের সম্পাদনার সময়ে রবীন্দ্র বৈষ্ণব পদাবলীকে আধ্যাত্মিকতা মুক্ত করে লৌকিক প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাই পূর্ব প্রকাশিত অন্যান্য বৈষ্ণব পদসংকলনের মত তিনি গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের মধ্য দিয়ে গ্রন্থের সূচনা না করে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলা থেকে নানা রস পর্যায়ের মধ্য দিয়ে রাধা কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার পরিসমপ্তি ঘটিয়েছেন। তার পর রাধা কৃষ্ণের যুগাবতার রুপে ধরাধামে অবতীর্থ শ্রীচৈতন্য দেবের মানবলীলাকে কেন্দ্র করে রচিত গৌরাঙ্গ বিষয় পদযুক্ত করেছেন। আলোচ্য বৈষ্ণব পদ সংকলনটিতে ২৫৭টি পদ রয়েছে। রবীন্দ্র সুরারোপিত পদের সংখ্যা ২ এবং রবীন্দ্রকৃত ১৫টি বৈষ্ণব পদের ইংরেজি অনুবাদ এই গ্রন্থে সংযোজিত করা হয়েছে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ পরিনত

বয়সে বাংলা কাব্য পরিচয় গ্রন্থে যে ১৪টি পদ যুক্ত করেছিলেন আলোচ্য সংকলনে তা থেকে ৪টি পদ গৃহীত হয়েছে। সংকলনে পর্যায় ক্রমে পদগুলি বিন্যস্ত না হলেও ভাবের ক্রমবিকাশ অনুযায়ী পদগুলিকে বাৎসল্য বাল্যলীলা সখ্যা গোষ্ঠলীলা (পূর্ব ও উত্তর গোষ্ঠ) পূর্বরাগ (সাযাদ্দর্শন) কৃষ্ণের পূর্বরাগ রাধার পূর্বরাগ অনুরাগ শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার রুপ বর্ণনা আক্ষেপান ুরাগ সম্ভোগ অভিসার দানলীলা রসোস্কার নৌকাবিলাস বাসকস্থা বসন্ত রাসলীলা ঝুলন ইত্যাদি নানা শ্রেনিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

> 'পদরত্নাবলী'-র বিন্যাসপদ্ধতি ও লক্ষ্য অংশে জানানো হয়েছে ঃ
> শিশুকৃষ্ণের জন্ম বাল্যলীলা/বাৎসল্য ও সখ্যরসের পদের পর রাধা কৃষ্ণের যৌবন লীলার পদগুলি বিন্যস্ত অতপর বিরহ ও সম্ভোগের বিচিত্র বিন্যাসে বৃন্দাবন লীলার মধ্য দিয়া বৈষ্ণব কবিতার গীত উৎসব মাসে রবীন্দ্রনাথ পদরত্নাবলীর পাঠক পাঠিকা গনকে যেন নিমগ্ন করিতে চাহিয়াছেন।

টিপ্পনী

ভাবসম্মিলনের মধ্য দিয়ে লীলার পরিসমাপ্তি সম্পর্কে জানানো হয়েছে ঃ (প্রেমের অনন্ত রহস্যময়তায় বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের পরিশেষে ভাবসম্মিলনের এই অসাধারণ পদটি স্থাপনা করিয়া গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন

জন্ম অবধি হৈতে ও রুপ নেহারিনু নয়ন
না তিরস্পিত ভেলা।
লাখ লাখ যুগ হাম, হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে
হৃদয় জুড়ন নাহিগেলা।।

'পদরত্নাবলী'-র ৮১পৃষ্ঠার প্রথম সংস্করনে রাধা কৃষ্ণলীলার যে ক্রমটি রক্ষিত হয়েছিল পরে পরিমার্জিত সংস্করনে নতুন পদের সংযোজনায় তা অনেকখানি ব্যাহত হয়েছে। বিশিষ্ট বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ও সাহিত্যের সমালোচক বিমান বিহারী মজুমদার সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষন করে লিখেছেনঃ

> পদরত্নাবলীতে পদ সন্নিবেশের রীতি মৌলিক ও রসের পরিপোষক বটে, কিন্তু দু একটি স্থলে লীলার পৌবাপর্য রক্ষিত হয় নাই।

পদবিন্যাসের ক্রুটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট অবহিত ছিলেন বলেই পাঠককে একটু বুঝিয়া পড়িতে অনুরোধ করেছিলেন। এই সামান্য ক্রুটি সত্ত্বেও পদাবলীর বিন্যাসের অভিনবত্বে পদরত্নাবলী পূর্বাপর সমস্ত বৈষ্ণব পদ সংকলনের মধ্যে যথেষ্ট মৌলিকতার অধিকারী হয়ে উঠেছে।

২.৬ দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা

বৃন্দাবনের পটভূমিকে রাধাকৃষ্ণের প্রনয়লীলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের মুখ্য বিষয়। চৈতন্য পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্য দেবকে রাধাকৃষ্ণের যুগ্মাবতার হিসেবে গ্রহণ করে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুযায়ী রাধা কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার সঙ্গে সামজতস্যপূর্ণ গৌরাচন্দিকা ও শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলার পরিপ্রেক্ষিত গৌরাঙ্গঁবিষয়ক পদ নিয়ে হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী এক সমৃদ্ধ সাহিত্যশাখার সম্মান লাভ করেছে। মধ্যযুগের দেবনির্ভর সাহিত্য রচনার

টিপ্পনী

যুগে কবিদের আত্ম গত অনুভূতির সুযোগ না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা বিরহ মিলনের অনুভূতিকে দেবতার মুখে আরোপ করে তাকে অলৌকিক বা আধ্যাত্মি ক করে তুলেছেন। ভারতীয় সাহিত্যে রাধা কৃষ্ণবিষয়ক পদ রামার ধারায় শ্রীমদ্ভাগবত বিভিন্ন পুরান থেকে যেমন বিবিধ উপাদান সংগৃহীত হয়েছে তেমনি সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকা নানা লোক কাহিনি ও কিংবদন্তি থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। রাধা কৃষ্ণের কাহিনি তাই একধারে অধ্যাত্মিক ও লৌকিক। বৈষ্ণব পদকর্তারা পদাবলীর মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের ছায়াপাত করলেও তাকে লৌকিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্যদিকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ও বৈষ্ণব রস শাস্ত্র রচিত হওয়ার ফলে বৈষ্ণব পদাবলী থেকে লৌকিক ঐতিহ্যটুকু বাদ দিয়ে তাকে পুরোপুরি আধ্যাত্মিক করা তোলা হয়েছে। তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃতে কাম ও প্রেমের পার্থক্য সুপাট ভাবে নির্দেশ করে বলেছেন ঃ

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম।।

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসের সাধনায় শ্রীরাধার মধুর রসের সাধনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

‘হলদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম’।

সেই প্রেম শ্রীরাধার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হওয়ায় রাধাকে মহাভাবরুপা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাধার প্রেম নিজের আস্বাদনের জন্য নয় তা কৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদনের জন্য নিবেদিত হওয়ায় রাধার প্রেম হয়ে উঠেছে নিকষিত হেম কামগন্ধ সাহি তায়। তাই বৈষ্ণব তাত্ত্বিকেরা রাধা কৃষ্ণের প্রেমকে ভক্ত ভগবানের সম্পর্কের বাইরে বলে মনে করেননি এবং সেভাবে তাঁরা ব্যাখ্যা করার পক্ষপাতি না হওয়ায় বৈষ্ণব পদাবলী থেকে লৌকিক বা মানবিক অনুভূতি কে সম্পূর্ণ রুপে উপেক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু প্রেমও প্রকৃতি গীতকবিতার চিরন্তন উপকরণ আবার বিরহ মিলন পূর্ণ প্রেমের ক্ষেত্রে চিরকাল মিলনের চেয়ে বিরহকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে উপকরণের দিক দিয়ে লৌকিক প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব পদাবলীকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দেওয়া গেলেও নৌষ্ঠিক বৈষ্ণবেরা রাধা কৃষ্ণের প্রেমকে আধ্যাত্মিকতা শূন্য করে বিচার করতে চাননি। কিন্তু তার মধ্যে যে সৌন্দর্য বোধের প্রকাশ বিচ্ছুরিত তা আধ্যাত্মিকতা টুকুকে বজন করলে হ্রাস পায় না বলেই রবীন্দ্রনাথ পদরত্নাবলী সম্পাদনার সময় বৈষ্ণব পদাবলীকে আধ্যাত্মিকতার আবরণ মুক্তকরেও মানবিক করে তুলতে চেয়ে ছিলেন তাই পদরত্নাবলীর গ্রন্থ প্রসঙ্গ অংশে বলা হয়েছেঃ

> বৈষ্ণব কবিতাকে প্রবহমান মানব জীবন হইতে দূরবর্তী অবাস্তব অলৌকিক বস্তু রুপে রবীন্দ্রনাথ কখনই গ্রহণ করেন নাই। লৌকিক জীবনের প্রেমের মধ্যেই দেবত্ব বর্তমান,বৈষ্ণব কবিতা সেই দিকটিই স্পষ্ট করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে ভক্ত ভগবানের যে সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে তার চরমোৎকর্ষ ফুটে উঠেছে প্রেমে। বৈষ্ণব পদকর্তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই সংস্কৃত কাব্যে। প্রকৃত অপভ্রংশ বা অবহট্ট ভাষায় রচিত পদে যেখানে স্হূল রুচি পরিচয় রয়েছে সেখান থেকে তাঁরা প্রেমকে বিশুদ্ধ নিস্কাম প্রেমে পরিশুদ্ধ করে ঈশ্বর উপাসনার উপযোগী করে তুলেছেন। এই বৈষ্ণব পদাবলীতে পূজনীয়ের প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগ যেমন ভক্তিতে পরিনত হয়েছে তেমনি তার মধ্যে দেব ও মানবের সহজ সম্পর্কেও স্পষ্ট রুপে আভাসিত হয়েছে।

চন্ডীদাসের রাধা যখন বলেন ঃ

রাধার কি হৈল অন্তরেতে ব্যথা
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে
না শুনে কাহরু কথা।

তখন এই বিরহ বেদনার মধ্যে চিরন্তন প্রেমিকার আর্তি প্রকাশিত হওয়ায় মানবী প্রেম ঈশ্বর উপাসনার সামগ্রী হয়ে উঠেছে। আবার বিরহ অনলে দগ্ধ হয়ে রাধা মিলনানন্দ লাভের জন্য যখন অভিসার যাত্রা করেন তখন সামাজিক সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অস্বীকার করে বলেন ঃ

টিপ্পনী

কুলমরিয়াদ
কবাট উদঘাটনু
তাহেকি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযদি
সিন্ধু সঙ্গে ডারনু
তাহে কি তটিনী অগাধা।

রাধা প্রেমের জন্য সমস্ত বাধা বন্ধন অতিক্রম করে যখন প্রিয় মিলনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন তা দেবতার উদ্দেশ্যে দুর্জয় পদযাত্রায় অনায়াসে তীর্থ যাত্রায় পরিণত হয়ে ওঠে । আবার শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের রাধার অন্তরে যেনি সীম শূন্যতা দেখা দেয় তা শুধু ভগবানের জন্য ভক্তের বিরহ কাতরতা নয় চিরন্তন প্রেমিকার বেদনার্তি প্রকাশ করে তিনি বলেন ঃ

অব মথুরা পুর মাধব গেল গোকুল
মানিক কো হরি নেল।। গোকুলে
উছলল করুনাক রোল। নয়নের
জলে দেখ বহয়ে হিলোল।।

বিরহ মিন পূর্ণ প্রেমের ক্ষেত্রে প্রেমিকার আত্নত্যাগ , বিরহদীর্ন হৃদয়ের হাহাকার আর ভক্ত ভগবানের পরস্পারিক সম্পর্ক একত্রে আভাসিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ

দেবতারে যাহা দিতে পারি
তাই দিই প্রিয়জনে, আর পানে কোথা
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

২.৭ বিরহ মিলনের মানস রাজ্য

বৈষ্ণব পদাবলীকে বৈষ্ণব কবিতা বলে উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ শুধু তাকে আধ্যাতিকতা মুক্ত করেননি, রাধা কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা যে শুধু বৃন্দাবনের পটভূমিতে নয় আমাদের মনোজগতেও নিত্য বিরাজমান তার ইঙ্গিত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন ঃ

মনের ভিতর একটা উতলা উন্মনা ভাব নিয়ে আজ প্রতি কাল থেকে পদরত্নাবলীর পাতা ওল্টাছি – বৃন্দাবন নামক বিরহ মিলনের একটা মানসরাজ্য দেখতে পাচ্ছি।

টিপ্পনী

'পদরত্নাবলী'তে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্র অনুযায়ী পূর্বরাগ অনুরাগ অভিসার মান মাথুর ভাবোল্লাস মিলন ইত্যাদি ক্রম অনুযায়ী পর্ব বিন্যাস করেননি । মানবিক প্রেমের বিরহ মিলন পূর্ণ অনুভূতিতে তিনি যেভাবে রাধা কৃষ্ণের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া অনুসারে পদগুলি সংকলিত করেছেন তার ফলে রাধা কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা যেন পাঠকের মানসরাজ্যে নিত্য প্রতিফলিত হয়ে চলেছে । প্রেমের জাগরণ থেকে সূক্ষাতি সূক্ষ হৃদয় বৃত্তি গুলিতে তিনি যেন সূত্রে মালার মত গ্রথিত করে তাকে এক অখন্ড অনুভূতির স্তরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন । উদাহরণ দিয়ে বলা যায় শ্রীকৃষ্ণের রুপ দর্শনে রাধার মনে প্রথম প্রেমের জাগরনের কথা উল্লেখ করে পদকর্তা অনন্ত দাস বলেন ঃ

রমনীরমনবর
গতি অতিমন্থর
মনোহরের মনোহর বেশ ।
মৃগমদ চন্দন তনুঘন লেপন
পরিমলে ভুলায়ল দেশ।।

শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে দেশবাসীর অবস্থার কথা বর্ণনার পর রাধা নিজের মানসিক যে প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখে করেছেন তার পরিচয় রয়েছে অনন্ত দাসের অন্য একটি পদে । সেখানে তিনি বলেছেন ঃ

কিহেরিনু কদম্ব তলাতে।
বিনি পরিচয়ে মোর পরান কেমন করে
জিতে কি পারিয়ে পসারিতে।।

কিশোর বয়েস বেশ, আর তাহে রসাবেশ
আর তাহে ভাতিয়া চাহনি।
হাসির হিল্লোলে মোর পরান পুতুলি দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি।।

শ্রীকৃষ্ণের রুপদর্শনের পর রাধার মনে পূর্বরাগ বা প্রেমের যে প্রাথমিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তার পরিচয় ধরা পড়েছে চন্ডীদাসের একটি জনপ্রিয় পদে। সেখানে রাধার জবানীতে কবি বলেছেন

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারু কথা।।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙাবাস পরে
যেন যোগিনী পারা।।

বিশুদ্ধ প্রেম জাগতিক ভোগসুখ কামনা বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে কী ভাবে আকাঙ্খিত বস্তুকে পাওয়ার জন্য যৌবনে যোগিনীহয়ে ওঠে রাধার আচরণের মধ্যে তার বহিপ্রকাশ ঘটেছে। তিনি

বিশের তাবৎ কৃষ্ণবস্তুর মধ্যে জড় ও জীবের পার্থক্য ভুলে কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী হয়ে ঃ

আলাইয়া বেনী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে আপন চুলি
হাসিত বদনে, চাহে মেঘপানে
কি চাহে দুহাত তুলি।।

রাধা নিজের মানসিক চঞ্চলতায় যে ভাবে বেদনার্ত হয়ে উঠেছেন তার পরিচয় দিয়ে জান দাস বলেছেন

টিপ্পনী

জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিল ছলিয়া নাগর ছলে।।
রুপের পাথরে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের মনে মন হারাইয়া গেল।।

এ অনুভূতি কেবল শ্রীরাধার নয়, প্রেমের স্পর্শে হৃদয়ের জাগরনে মানব মন প্রার্থিত জনের জন্য কী ভাবে ব্যাকুল হয়ে ওঠে উদ্ধৃত পদে তার পরিচয় রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের সম্মোহিনী শক্তির প্রভাবে রাধার অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে চন্ডীদাস বলেছেন ঃ

কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান
অবলার প্রাণ নিতে ত্রাহি তোমা হেন।।
রাতি কেলু দিবস দিবস কেলু রাতি।
বুঝিতে না রিনু বন্ধু তোমার পিরিতি।।

হৃদয়ের জাগরনে এই দুর্নিবার প্রেমের আকর্ষনে প্রাকৃতিক, সামাজিক পারিবারিক প্রতিবন্ধকতাকে কীভাবে জয় করতে হয় বৈষ্ণব কবিরা তার অনুপুঙ্খ পরিচয় দিয়েছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রাধার প্রিয় মিলনের জন্য সংকেত কুজেতর দিকে অভিসার যাত্রার পরিচয় দিয়ে গোবিন্দদাস বলেছেন ঃ

গগনে অবঘন মেহ দারুন
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন,
পবন খরতর বলগই।।

শুধু বর্ষা প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থার জন্য পরকীয়া প্রেম সমাজ অনুমোদিত নয় বলে গৃহের কপাট গুরুজনের তর্জন গর্জনকে উপেক্ষা করে রাধা অভিসার যাত্রা করেছেন। কিন্তু মিলনের রেশটুকু মুছে না যেতেই কৃষ্ণ মথুরা গমন করায় রাধার হৃদয় বিদারী অর্তনাদের পরিচয় দিয়ে বিদ্যাপতি বলেছেন ঃ

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মানিক কো হরি নেল।।
গোকুলে উছলল করুনা রোল।
নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিলোল।।

বৈষ্ণব কবিরা রাধার বেদনায় অস্থির হয়ে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ফিরে না এলেও স্বপ্ন মিলনে বা ভাবজগতে রাধা কৃষ্ণের মিলন ঘটিয়ে বৃন্দাবন লীলার মাধুর্যময় পরিনতির দিয়ে রাধার আনন্দের কথা প্রকাশ করে পদকর্তা বিদ্যাপতি বলেছেন ঃ

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন, সফল করি মানলু,
দশদিশ ভেল আনন্দা।।

টিপ্পনী

তাই বৈষ্ণব কবিরা বৃন্দাবনের পটভূমিতে রাধা কৃষ্ণের যে প্রেমলীলার কথা বর্ণনা করেছেন তা শুধু বাহ্যিক জগতের দুই নর নারীর নয়, চিরন্তর মানব মানব মানবীর যে হৃদয় ব্যাকুলতা নিত্য প্রেমিক প্রেমিকার অন্তরে ঘটে যায় বৈষ্ণব কবিরা তাঁদের রচিত কবিতা আমাদের যেন সেই মানস রাজ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন বলে রবীন্দ্রনাথ তার আলোচ্য পত্রটিতে সঠিক অর্থেই উল্লেখ করেছেন।

২.৮ শেষে গৌরাঙ্গ বিষয় কবিতা বসানোর কারণ

খেতুরী মহোৎসবে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পালাবদ্ধ কীর্তনগানে আসরে রাধা কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলারস পরিবেশনের আগে সমজাতীয় চৈতন্যলীলার পদ পরিবেশনের রীতিকে গৌরচন্দ্রিকা বলা হয়। পদরত্নাবলী র আগে প্রকাশিত অন্যান্য পদ সংকলনেও গৌরচন্দ্রিকার পরে বৃন্দাবন লীলার পদ বিন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পদরত্নাবলী সংকলনের সময় পূর্ব রীতি ও পদ্ধতি না মেনে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ শেষে সংযোজন করেছেন। অবশ্য তার মধ্যে যথেষ্ঠ অভিনবত্বের পরিচয় রয়েছে। ধর্মতত্ত্ব নয় বিশুদ্ধ সাহিত্য রস পরিবেশনের জন্য তিনি এই জাতীয় বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। প্রসাঙ্গতে উল্লেখযোগ্য যে ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান গ্রন্থে জানিয়েছেন ঃ

> রবীন্দ্রনাথ কীর্তনগানের জন্য অথবা রাধা কৃষ্ণলীলারস আস্বাদনের জন্য পদ সংকলন করেন নাই বলিয়া গ্রন্থের প্রথমে গৌরচন্দ্রিকার পদ দেন নাই।

শুধু তাই নয় বৈষ্ণব রস শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী পূর্বরাগ অনুরাগ অভিসার ইত্যাদি পর্যায়ের ক্রমও পদরত্নাবলী তে নেই। এই বৈশিষ্ট্যের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আনন্দ সংস্করনের বিন্যাস পদ্ধতি ও লক্ষ্য অংশে বলা হয়েছে ঃ

> শিশু কৃষ্ণের জন্ম বাল্য লীলা / বাৎসল্য ও সখ্য রসের পদের পর রাধা কৃষ্ণের যৌবনলীলার পদ গুলি বিন্যস্ত অতঃপর বিরহ সম্ভোগের বিচিত্র বিন্যাসে বৃন্দাবন লীলার মধ্য দিয়া বৈষ্ণব কবিতার গীত উৎসবমাঝে রবীন্দ্রনাথ পদরত্নাবলীর পাঠক পাঠিকাগণকে যেন নিমগ্ন করিতে চাহিয়াছেন

যার ফলে ভাবসম্মিলনের জন্ম অবর্ধি হৈতে ও রুপ নিহারিনু পদের সংযোজনার মধ্য দিয়ে প্রেমের অনন্ত রহস্য ময় তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। লৌকিক প্রেমের মধ্যেই দেবত্ব বর্তমান। এই দিকটিকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য চৈতন্যের মানব রুপের পরিচয় দেওয়ার জন্যই রবীন্দ্রনাথ গৌরাঙ্গ বিষয় পদকে শেষে যুক্ত করেছেন। তবে গ্রন্থটির সম্পাদনা কালে যে

ত্রুটি ঘটেছে তার উল্লেখ করে বিমান বিহারী মজুমদার বলেছেন ঃ

> পদরত্নাবলীতে পদ সন্নিবেশের রীতি মৌলিক ও রসের পরিপোষক বটে, কিন্তু দু একটি স্থলে লীলার পৌর্বাপর্য রক্ষিত হয় নাই।

এই ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্যই রবীন্দ্রনাথ পাঠকদের একটু বুঝিয়া পড়িতে অনুরোধ করেছিলেন।

২.৯ লিরিকে ভঙ্গী ও ভাষা

টিপ্পনী

প্রাচীন কালে য়ুরোপে Lyre বা বীনাজাতীয় বাদ্য যন্ত্র সহযোগে যে গান গাওয়া হতো তাকে Lyric নামে অভিহিত করা হয়েছিল Lyric শব্দের অনুসরণে বাংলা গীতি কবিতা শব্দটি গৃহীত হয়েছে। তবে পুরাতন যুগের Lyric আর আধুনিক এক জাতীয় নয়। প্রাচীন বা মধ্যযুগের মত এ যুগে আর বাদ্য যন্ত্র সহযোগে গান গেয়ে Lyric বা গীতি কবিতা পরিবেশন করা হয় না। পুরাতন যুগের Lyric ও আধুনিক যুগের Lyric-এর মধ্যে গুনগত পার্থক্যের ইঙ্গিতে দিয়ে ইংরেজ কবি প্রাবন্ধিক ও সমালোক Ruskin বলেছেন ঃ

Lyric Poetry is the expression by the poet of his own feelings

প্রেম পৃথিবীর সব দেশেই Lyric বা গীতি কবিতার প্রধান উপকরন হিসেবে গৃহীত হয়েছে। মধ্য যুগের গোষ্ঠীবদ্ধজীবন যাত্রায় আত্মকথনের সুযোগ না থাকায় কবিরা নিজেদের মনের কথা ব্যক্ত করার জন্য যেভাবে দেব দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করতেন বৈষ্ণব কবিরাও সেভাবে নিজেদের মনের কথাকে রাধা কৃষ্ণের সাহায্যে প্রকাশ করার আধুনিক গীতি কবিতার সঙ্গে পার্থক্য থাকলেও বৈষ্ণব কবিতাকে যথার্থ গীতি কবিতা বলে গ্রহণ করা যায়।

গীতি কবিতায় পরিমিত কাঠামোর মধ্যে কবিমনের আবেগ সামজস্যপূর্ণ ভঙ্গীতে পরিবেশিত হয়ে থাকে এবং তার মধ্যে অসাধারণ শিল্প সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায় বৈষ্ণব কবিতার রাধা কৃষ্ণের বিরহ মিলন পূর্ণ লীলা রসের পরিচয় দিতে গিয়ে বৈষ্ণব কবিরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দুটি নর নারীর বিরহ বেদনাকে তাঁরা চিরন্তন মানব মানবীর হৃদয়ের হাহাকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রশ্ন করেছিলেন ঃ

> সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি
> কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান বিরহ তাপিত হেরি কাহার নয়ান
> রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে

প্রেম মানব জীবনের একটি মূল্যবান অনুভূতি। কিন্তু প্রিয় মিলনের চেয়ে বিরহের মধ্যেই প্রেমের মাধুর্য্য অধিকতর পরিস্ফুট হয়ে থাকে। বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়ের পদের মধ্যে যে হৃদয় বির্দীন হাহা কারের পরিচয় রয়েছে পদরত্নাবলী তে রবীন্দ্রনাথ তাকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

তরুমূলে শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনি শুনে শুধু শ্রীরাধা নয় পার্থিব নানা বস্তুর মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে পদকর্তা অনন্ত দাস বলেন ঃ

মুরলীর আলাপনে পবন রহিয়া শুনে
যমুনায় বহয়ে উজান
না চলে রবির রথ, বাজি নাহি পায় পথ
দরবয়ে দারু পাষান।।

সাক্ষাৎ দর্শনের ফলে রাধার অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেছেন ঃ

কি হেরিনু কদম্ব তলাতে।
বিনি পরিচয়ে মোর পরান কেমন করে
জিতে কি পারিয়ে পসারিতে।।

টিপ্পনী

প্রেমের জাগরনে রাধার মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে পদকর্তা চন্ডীদাস বলেন ঃ

রাধার কি হৈল অন্তরেতে ব্যথা
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারু কথা।।

রাধার দৃষ্টিতে কৃষ্ণের রুপ বর্ণনা করে গোবিন্দ দাস যেমন বলেন ঃ

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গেঁর লাবনী
অবনী বহিয়া যায়
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিলোলে
মদন মূরছা পায়।।

আবার চন্ডীদাস তেমনি কৃষ্ণের দৃষ্টিতে রাধার রুপ বর্ণনা করে বলেন :

রমনীর মনি পেখলু আপনি
আভরণ সহিত গায়
দেখিতে দেখিতে বিজুরীময়
ধৈরয়ের ধৈরয় যায়।।

কৃষ্ণ প্রেমে দগ্ধ রাধার পরিচয় দিয়ে জ্ঞানদাস অসাধারণ কবিত্বের সঙ্গে রহস্যময়তার পরিচয় দিয়ে বলেন ঃ

চন্দন চাঁদের মাঝে মৃগমদে ধান্দা।
তারমাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বান্ধা।।
কটি পীত বসনরসনা তাহে জড়া
বিধি নিরমিব কুল কলঙ্কের কোঁড়া।।
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষনা রহিন।।

বিভিন্ন রস পর্যায়ের মধ্য দিয়ে রাধা কৃষ্ণের মিলন ও মথুরাগমনের ফলে রাধার বিরহ বেদনার তীবতার পরিচয় দিয়ে বৈষ্ণব কবিরা যেমন প্রেম মনস্তত্ত্বের সুনিপুন রুপকার হয়ে উঠেছেন, তেমনি রাধার বিরহ বেদনা সহ্য করে না পেরে ভাবলোকে বা মনোজাগতে রাধা

কৃষ্ণের মিলন ঘটিয়ে তারা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে অসামান্য নৈপুন্যের পরিচয় দিয়েছেন। পদরত্নাবলী তে রবীন্দ্রনাথ রাধা কৃষ্ণের লীলারসের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন ভাবোল্লাসের পদে। যার ফলে বৈষ্ণব পদাবলীতে যে। আধ্যাত্মিকতার আচরণে প্রেমকে আবৃত করে রাখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তা থেকে রাধা কৃষ্ণের প্রেমকে মানব মুখী করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

রোমান্টিক গীতিকবিরা যেমন প্রেমের অঙ্কুরকে উন্মোচিত করার জন্য প্রকৃতিকে পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন বৈষ্ণব কবিরাও তেমনি রাধা কৃষ্ণের প্রেমকে পরিনতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে বিশেষ ভাবে ব্যবহার করে। রাধার মানসিক বিপর্যয়কে প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত করে অভিসার পর্যায়ের পদে রায় শেখর বলেন ঃ

টিপ্পনী

গগনে অবঘন মেহ দারুন
সঘনে দামিনী ঝলকই
কুলিশ পাতন শাবদ ঝন ঝন,
পবন খরতর বলগই।।

শুধু বর্ষার ঘনান্ধকার পরিবেশ বর্ণনা নয়, ফুল্লকুসমিত বসন্তের বর্ননা দিয়ে গোবিন্দ দাস অসাধারন চিত্র সৌন্দর্য রচনা করে বলেন ঃ

ত্রু তরু নব কিশলয় দল লাগি। ক
ুসুম ভরে কত অবনত শাখী তহি
শুক সারিনী কোকিল বোল কুজত
নিকুজত ভ্রমর করু রোল।।

গীতকবিতার আত্ম গত ভাব প্রকাশিত হয় ভাষার অসাধারন বয়নে। শব্দ অলঙ্কার ও ছন্দোরীতির সুষম প্রয়োগে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। মধ্য যুগের কবি হয়েও বৈষ্ণব পদকর্তারা অনায়াসে গ্রাম্যতা বা স্থূলতাকে অতিক্রম করে কবিতার মধ্যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য সৃষ্টিতে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। বজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষায় পদ রচনায় তাঁরা যথেষ্ট নাগীরক বৈদগ্ধ্যে তাঁর পদ যেমন উজ্জ্বল তেমনি তাঁর অনুগামী গোবিন্দদ্বিতীয় বিদ্যাপতির পদ রচনায়সেই বৈদশধ্য যেমন প্রতি ফলিত হয়েছে তেমন গোবিন্দ দাসের পদে চিত্র ধর্মিতা নাটকীয় সংলাপ ও উৎকণ্ঠার (suspense) পরিচয় লক্ষ করায় চন্ডীদাসের সহজ সরল ভাষা প্রাজ্ঞল প্রসাদ গুনে যেমন ভরা তেমনি জতানদাসের পদে আপ্লুত বিরহ মিলনের অনুভূতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে রহস্যময়তা ও মরমিয়া (Mystic) দৃষ্টিভঙ্গী। মধ্যযুগের বাংলার ভাষা ভঙ্গীর সঙ্গে পেখনু দেখলু ভেল দেন ইত্যাদির মত ক্রিয়া পদের ব্যবহারের সঙ্গে নিরদন্দ দরবয়ে পিরিতি ধরম মুকতি জাতীয় স্বরভক্তির প্রয়োগ তার মধ্যে রয়েছে আবার 'ঝন ঝন শবদ কুলিশ ঝন ঝান' বা 'ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত'-পংক্তির মত ঝন ঝন ঘন ঘন জাতীয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ অনুপ্রাস ও উপরা জাতীয় বিবিধ অলঙ্কারের ব্যবহার বৈষ্ণব কবিতাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে কাব্যের কায়া গঠনের ক্ষেত্রে পয়ার ও ত্রিপদীতে চরণ বিন্যাস করা হয়েছে তাই বলা যায় বৈষ্ণব কবিরা সচেতন শিল্পীর মতই রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করে তুলেছেন।

২.১০ রবীন্দ্র সুবাসিত বৈষ্ণব কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আবাল্য বৈষ্ণব পদাবলীর একনিষ্ঠ পাঠক। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে ভানুসিংহের পদাবলী রচনা বা বৈষ্ণব পদাবলীর অনুষঙ্গে কবিতা রচনা ছাড়াও চিঠিপত্র ও বিভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন পদকর্তা রচিত বৈষ্ণব পদকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার ফলে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব পদের রসগ্রাহিতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ছিন্ন পত্রাবলীর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বর্ষা প্রকৃতির সৌনদর্য সম্পর্কে বলেছেন এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণব কবিদের সেই অনন্ত বৃন্দাবন রয়ে গেছে 'মেঘদূত' প্রবন্ধ ও সাহিত্য গ্রন্থের অন্তগর্ত সাহিত্যের তাৎপর্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবি বলরাম দাসের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বসন্ত রায় প্রবন্ধে বসন্ত রায় এবং বৈষ্ণব কবির গান প্রবন্ধে জ্ঞান দাস রচিত "মনের মরন কথা" শীর্ষক পদটির রবীন্দ্রনাথকৃত শিরোনাম "স্বপ্ন" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "শ্যামলী" কাব্যে একই শিরোনামের কবিতায় জ্ঞানদাসের পদটির নিহিত ভাবটিকে এ কালের সীমানায় আনিয়া দিয়াছেন সরলাদেবীর লেখা জীবনের ঝরাপাতা গ্রন্থে থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির একাধিক পদে সুরারোপ করেছিলেন 'যব গোধূলি সময় বেলি' পংক্তিযুক্ত বিদ্যাপতি রচিত পদটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের অতিরিক্ত আকর্ষনের পরিচয় পাওয়া যায় বৈষ্ণব কবিতার রসাস্বাদন রবীন্দ্রনাথের কাছে এমন তীব হয়ে উঠেছিল যে তিনি বৈষ্ণব কবিতার যে সমস্থ ইংরেজি অনুবাদ করেছিল 'The Fugitie'(1921) গ্রন্থের তা সংকলিত হয়েছে 'পদরত্নাবলীর' পরিশিষ্ট-২ অংশে তা স্থান পেয়েছে।

২.১১ আত্নমূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্ন

১ 'পদরত্নাবলী'-র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন

২ 'পদরত্নাবলী'-র বৈশিষ্ট্য গুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন

৩ 'পদরত্নাবলী'-র কবিতা কী ভাবে আধ্যাত্নিক না হয়ে মানবিক হয়ে উঠেছে আলোচনা করুন।

৪ 'পদরত্নাবলী'-তে সংকলিত রবীন্দ্রসুবাসিত বৈষ্ণব কবিতার পরিচয় দিন।

২.১২ উত্তর লিখে পাঠানোর জন্য প্রশ্নাবলী

১ 'পদরত্নাবলী'-র বিন্যাস পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২ 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা' - ভাবটি পদরত্নাবলীতে কী ভাবে প্রকাশিত হয়েছে ব্যাখ্যা করুন।

৩ বৈষ্ণব কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ বিরহ মিলনের মানস রাজ্য বলে কেন উল্লেখ করেছেন তা বুঝিয়ে দিন।

৪ 'পদারত্নাবলী'-তে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ শেষে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

টিপ্পনী

৫ লিরিকের ভঙ্গী ও ভাষা ‘পদরত্নাবলী’-তে কী ভাবে ধরা পড়েছে তা আলোচনা করুন।

৬ বৈষ্ণব কবিতায় প্রেমের সঙ্গে প্রকৃতির যোগাযোগের বিষয়টি পদরত্নাবলীর সাহায্য নিয়ে বুঝিয়ে দিন

৭ বৈষ্ণব পদকর্তাবা কী ভাবে প্রেমমনস্তত্ত্বে র সুনিপুন রুপকার হয়ে উঠেছেন তা ‘পদরত্নাবলী’-তে অংকলিত কয়েকটি পদের সাহায্য নিয়ে আলোচনা করুন

৮ বৈষ্ণব পদ সংকলনের নিরিখে ‘পদরত্নাবলী’ কী ভাবে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে আলোচনা করুন।

টিপ্পনী

২.১৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১ মধ্য যুগের কবি ও কাব্য শংকরী প্রসাদ বসু

২ বৈষ্ণব সাহিত্য প্রবেশিকা হিমাংশু চৌধুরী

৩ বৈষ্ণব সাহিত্য ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী

৪ পদরত্নাবলী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্রমজুদার সম্পাদিত

৫ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ডঃ অমিত কুমার বন্ধোপাধ্যায়।

৬ বৈষ্ণব রস প্রকাশ ডঃ ক্ষুদিরাম দাস

টিপ্পনী

তৃতীয় অধ্যায়

।। পদ্মাবতী ।।

৩.০ ভূমিকা

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ কবি পরিচয়

৩.৩ কবি প্রতিভা

৩.৪ আত্মমূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্ন

৩.৫ কাব্যের উৎস

৩.৬ কাব্যের কাহিনি

৩.৭ পদ্মাবতী কাব্যের ভাষা

৩.৮ পদ্মাবতী কাব্যে সঙ্গীত

৩.৯ পদ্মাবতী কাব্যে সমাজ ও সংস্কৃতি

৩.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩.১১ সহায়ক গ্রন্থ

টিপ্পনী

৩.০ ভূমিকা ঃ

মধ্যযুগে আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলনসেতু রচিত হয় এবং সেই মিলনের ফলশ্রুতিরূপে গড়ে ওঠে সপ্তদশ শতকের এক অভিনব রীতির মুসলমানী সাহিত্য। আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় এই সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল বলে একে আরাকান রাজসভার সাহিত্য বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আরাকানের আর একটি নাম ছিল রোসাঙ্গ। তাই সাহিত্যের ইতিহাসে এই সাহিত্যকে রোসাঙ্গের সাহিত্যও বলা হয়ে থাকে।

মুসলমানী সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে রোসাঙ্গ রাজ সভার উল্লেখ অবশ্যই করতে হয়। এ অঞ্চলটি বর্তমানে বন্মদেশের আরাকানে অবস্থিত হলেও এক সময়ে এখানে বাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্মও যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল আবার মুসলমানগণ বাংলা দেশে প্রভাব বিস্তার করবে আগেই এ অঞ্চলটি তাদের দ্বারা অধ্যুষিত হয়েছিল। ফলে রোসাঙ্গ রাজসভা পরিণত হলেও বাহ্মণ, বৌদ্ধ ও ইসলামী সভ্যতার ত্রিবেণী সঙ্গমে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রোসাঙ্গ রাজাদের ভেতর অনেকেই মুসলিম উপাধিত গ্রহণ করতেন।

এই রোসাঙ্ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কিছু মুসলমান কবি এখানে গড়ে তুলেছিলেন এক বিশিষ্ট সাহিত্য সম্পদ। নামে মুসলমানী সাহিত্য হলেও বিভিন্ন ধর্মীয় ভাবের সমন্বয় প্রচেষ্টা এদের মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে। বিশেষত রোসাঙ্ কা আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানী সাহিত্যেই মধ্যযুগীয় দেবনির্ভরতার কাহিনির পরিবর্তে সুস্পষ্ঠভাব্যে রচিত হত সম্পূর্ণ, লৌকিক প্রেম কাহিনির।

টিপ্পনী

এদের রচিত কাব্যের বিষয় খুব অল্পই হতো ভারতীয় কিন্তু সে বিষয়গুলো একেবারেই অবঙ্গীয়। এ জাতীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাও এসেছে এমন এক রাজ্য থেকে যেখানে জাতিগত ও ভাষাগতভাবে বাঙালি ও বাংলার কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকার কথা নয়। তবে কবিরা ছিলেন নিঃসন্দেহে বাঙালি ও বাংলা-ভাষাভাষী। এঁদের মধ্যে দুজন কবি উল্লেখযোগ্য - এরা হলেন দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল। এঁরা এঁদের কাব্যে মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতাকে প্রধান করে তোলেন নি। মানুষই কাব্যের নায়ক - এই ভাবনার প্রথম প্রবর্তকধর্মী সার্থক কবি চট্টগ্রামের আরাকান রাজসভার মুসলমান কবি হলেন দৌলত কাজী। এ ছাড়া আরও একজন প্রতিভাধর পন্ডিত কবির আবির্ভাবে আরাকান রাজসভা ও বাংলা সাহিত্য গৌরবান্বিত হয়েছিল। তিনি কবি সৈয়দ আলাওল। তিনি ছখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পদ্মাবতী (১৬৪৬) তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গ্রন্থটি একটি ইতিহাস ভিত্তিক কাহিনি কাব্যের ভাবনুবাদ। মহম্মদ জায়সী রচিত হিন্দি কাব্য "পদুমাবৎ" এর ভাবানুবাদ।

৩.১ উদ্দেশ্য ঃ

অনেক সাহিত্য সমালোচকই আলাওল রচিত পদ্মাবতী কাব্যকে প্রথম ঐতিহাসিক রোমান্স রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। 'পদ্মাবতী' কোনো মৌলিক কাব্য গ্রন্থ নয়। মহম্মদ জায়সী হিন্দী ভাষায় পদুমাবৎ নামে যে কাব্য রচনা করেন, কবি আলাওল তাকেই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। অনুদিত গ্রন্থ হলেও এখানে আমরা অনেক জায়গাতেই কবির স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাই। মহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যটি আমরা রূপক কাব্য হিসেবেই বিবেচনা করি। জায়সী তাঁর কাব্যে চিতোর রাজকে মন রূপে, বাজী রত্নসেনকে জীবাতমারূপে, রানী পদ্মাবতীকে বিবেকরূপে চিত্রিত করেছেন আর শক পার্থ সেখানে হয়েছে ধর্মগুরু। কিন্তু আলাওলের কাব্যটি হয়ে উঠেছে অনবদ্য এক প্রেমের কাহিনি। এ ছাড়া মূল কাহিনিতে যেখানে সম্রাট আলাউদ্দিনের বিজয়ের সংবাদ রয়েছে, আলাওল সেখানে সম্রাটেরা পরাজয় ঘোষণা করেছেন। কাহিনির এই পার্থক্যের পেছনে কবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ই আমাদের মুগ্ধ করে। কবি আলাওল মনে করতেন ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়ই সত্য। পদ্মাবতী কাব্য পাঠে আমরা কবিকে সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখি। কবি মুসলমান হলেও মুসলমান সম্রাট আলাউদ্দিনের পরাজয় তাঁর কাব্যে আমরা দেখতে পাই। স্বজাতি প্রীতি তাকে কিন্তু বিশ্বমানবিকতার পথ থেকে সরিয়ে দেয়নি।

৩.২ কবি পরিচয় ঃ

কবি আলাওলের জন্ম আনুমানিক সপ্তদশ শতকে। ফরিদপুরের অন্তর্গত জালালপুর গ্রামে। তাঁর পিতা ছিলেন সেখানকার শাসনকর্তা মজলিস কুতুবের আমাত্য। আলাওলের ব্যক্তিগত

জীবনে বিভিন্ন সময়ে নানারকম বিপর্যয় দেখা দেয়। অল্পবয়সেই পিতার সংগে জলপথে ভ্রমণ করবার সময় জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাতেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। জলদস্যুরা তাকে দাস হিসেবে আরাকাণের হাটে বিক্রি করে দেয়। সেখান থেকে কোনোরকমে তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পালিয়ে এলেন তিনি আরাকান বা রোসাঙে্ । গরোসাঙে্ র গরাজ সেনাপতির অধীনে অশ্বারোহী সৈন্য দলে যোগ দেন। মুখ্য পাটেশ্বরী যথাস্বিনীর আমাত্য মগন ঠাকুরের সংস্পর্শে এলেন, তাঁর আশ্রয় লাভ করলেন। কবি লিখেছেন, –

কহিতে অনেক কথা দুঃখ আপনার। রো
সাঙ্গে আসিয়া হেলুম রাজ-আসোয়ার।

টিপ্পনী

আলাওল কেবল কবি ছিলেন না, নৃত্য গীতেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। আলাওলের কবিত্ব, পান্ডিত্য, নৃত্য কুশলতা ও সঙ্গীত নৈপুন্যের জন্য মাগন তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে, গুরুর মতো তাকে সমাদর করে আমাত সভার নিয়ে আসেন। এবং তাঁরই একান্ত অনুরোধে আলাওল মহম্মদ জায়সীর, হিন্দী কাব্য পদুমাবৎ –এর অনুবাদ করে পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেন। অনুবাদ কাব্য হলেও পদ্মাবতী কাব্যটি ছবির নিজস্ব কবি প্রতিভার মৌলিকতারই পরিচয় বহন করে।

কবির জীবনে আরার নতুন করে এক বিপর্যয় নেমে এলো। মুখল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নজর এড়িয়ে তারই এক ভাই শাহ-সুজা তখন ছিলেন রোসাভে্। কবির সংগে ছিল তার হৃদ্যতট। সুজার সংগে কবির এই বন্ধুত্বের খবর ঔরঙ্গজেব জানতে পারলেন। আর তার ফলেই কবির জীবন আবার দুবিপাকের কবলে। কবিকে তাই ভোগ করতে হয় পঞ্চাশ দিনের কারাযন্ত্রণা। অবশ্য কিছু দিনের মধ্যেই কবি কারামুক্ত হলেন কয়েকজন রাজকর্মচারীর আনুকূল্যে। কিন্তু তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো। তাই দিন কাটাতে হলো অসীম দারিদ্র্য আর দুঃখের ভেতর দিয়ে। দীর্ঘ দশ এগারো বছর পর ১৬৭১ খীষ্টাব্দে মজলিসের অনুগ্রহে আবার তাঁর জীবনে সুদিন এলো। কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন।

আলাওলের চরিত্রে রয়েছে উদার মানবিকতার পরিচয়। কোনোরূপ সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, স্বজাতিপ্রীতি তাঁর চরিত্রে ছিল না। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত উদার মানসিকতা ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

সুফী সম্প্রদায়ের প্রধান তার সম্প্রদায়ভুক্ত। আলাওলের জীবন ছিল নানান উত্থান- পতন আর বন্ধুর জীবন।

আনুমানিক ১৬৭৩ অথবা ১৬৭৪ খীষ্টাব্দে কবির জীবনের অবসান হয়।

৩.৩ কবি প্রতিভা ঃ

সৈয়দ আলাওল ছিলেন মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর কাব্য তাঁর প্রতিভা পরিচয়ের সাক্ষ্য দেয়, সন্ধান দেয় বলিষ্ঠ জীবনাদর্শের। তার গ্রন্থ গুলো হলো –

ক) পদমাবতী (১৯৪৬)

খ) লোরচন্দ্রানী কাব্যের শেষ অংশ (১৬৫৯)

গ) সয়ফুলমূলক - বদিউজাজমলে (১৬৫৭-৭০)

ঘ) হপ্তপয়কর (১৬৬০)

ঙ) তোহফা (১৬৬৩-৬৯)

চ) দারা-সেকেন্দার নামা (১৬৭২)

টিপ্পনী

কবি আলাওল ছিলেন গুণী ব্যক্তি। অসাধারণ তাঁর পান্ডিত্য। কেবল কাব্য রচনায় নয়, সঙ্গীতশাস্ত্রে বা নৃত্যকলায়ত্ত তিনি ছিলেন পারদর্শী। অনেক গুলো ভাষায় যেমন - সংস্কৃত, বাংলা, আরবী, ফারসী ও হিন্দীতে, তাঁর দখল ছিল অত্যন্ত বেশী। তাঁর ভাষা ছিল মার্জিত, প্রসাদজ্ঞান সম্পন্ন। আর সে ভাষা প্রয়োগ করতে গিয়ে কবি পরিচয় দিয়েছেন তাঁর আলংকারিক দক্ষতার।

পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনি শুরু হয়েছে সিংহলদ্বীপ বর্ণনা থেকে। সিংহলদ্বীপ বর্ণনায় কবি অনেক জায়গায় বাংলা দেশের ফল ফুল লতাপাতার পরিচিত দৃশ্য এঁকেছেন। সিংহল দ্বীপের বর্ণনা করতে গিয়ে আলাওল তাঁর কাব্যে অনেক জায়গাতেই বঙ্গ নৃপতির মজলিসের আসর করে তুলেছেন। আলাওল পদ্মাবতী চরিত্রেও এনেছেন জীবন চাঞ্চল্যময়ী এক নারীর ভূমিকা। পদ্মাবতীর যৌবন উন্মেষের বর্ণনায় আলাওলের রচনা মূল কাব্য থেকেও অনেক বেশী উজ্জ্বল ও জীবন্ত। মূল কাব্যকে অনুসরণ না করে আলাওল যেখানে স্বাতন্ত্র দেখিয়েছেন সেখানে তা চমৎকার কাব্য সৌন্দর্য লাভ করেছে। আলাওলের উপমা কখনও কখনও মূলাতিক্রমী ভাবব্যঞ্জনী লাভ করেছে। অধর বর্ণনায় মূলে যেখানে আছে 'পানের রসে অধর মঞ্জিষ্ঠার মতো রক্তিম', আলাওল সেখানে লিখেছেন, 'তাম্বুল রাতুল হৈল অধর পরশে'। মূলে যা সাধারণ একটি উপমা, অনুবাদে তা অসাধারণ একটি উৎপ্রেক্ষা হয়ে উঠল।

সমাজ ও জীবন সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক। রচনার মধ্যে বাঙালিত্বই প্রাধান্য পেয়েছে। পদ্মাবতীর বিবাহ বর্ণনায় আলাওল বাঙালিদের বিয়ের, রীতি ও স্ত্রী আচার সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা যথার্থই ছিল বিশ্ময়কর। আলাওলের কাব্যে হিন্দু পুরাণ ও লোক সংস্কারের অনেক নিদর্শনই পাওয়া যায়।

আলাওল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত উদার মানসিকতা ও সংস্কৃতিতে ছিলে বিশ্বাসী। ধর্মের কোনও গোঁড়ামি ছিল না। তাঁর কাব্য কোনও গোঁড়ামি দ্বারা আড়ষ্ট হয় নি। জন্ম ভূমির বর্ণনায় হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির কথাই লিখেছেন।

রোমান্টিক হৃদয় ধর্মিতার প্রকাশ তাঁর কাব্যের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে রোমান্টিক হৃদয়ধর্মিতার সংগে অন্যাতম অনুভূতির মিলকে তাঁর কাব্যে অভিনব রসসৃষ্টি সার্থক হয়েছে। প্রকৃতি বর্ণনায় কবির জীবনমুখীনতা ও রসসৃষ্টির প্রয়াস অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতাতো ছিলই ব্যক্তিজীবনেও তিনি ছিলেন একজন সঙ্গীতজ্ঞ। শুধু তাই নয় পদ্মাবতী কাব্যে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় প্রায় তেরোটি গীতরচনায়। কেবল পদ্মাবতী কাব্যেই নয়, অন্যান্য অনুবাদ কাব্যও তিনি স্বরচিত গীত রচনা করেছেন।

ভাষা, ছন্দ ও অলংকারের ব্যবহারেও তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। তাঁর ভাষা ছিল প্রসাদগুনি

সম্পন্ন, তাতে সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের পরিচয় আছে, তেমনি আছে আলংকারিক দক্ষতা। অল্প জায়গাতেই আরবী, ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন উপযুক্ত দেশী শব্দ পোল আর বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেন নি।

তিন প্রধান বাংলা শব্দের মধ্যে আলাওল অধিক পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তার প্রধান ও ধ্বনি প্রধান ছন্দের ব্যবহারে। আলাওল তাঁর পদ্মাবতী কাব্যে বর্ণনাত্মক পয়ার, গীতাত্মক লাচাড়ি ও সঙ্গীতময় পদরীতির ত্রিবিধ প্রয়োগে ছন্দের নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন যা কিন্তু মূল কাব্যে আমরা পাই না।

টিপ্পনী

৩.৪ আত্মমূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্ন ঃ

১) ব্যক্তিগত ভাবে কবি আলাওলের জীবন কীভাবে কতবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে?

২) মহম্মদ জায়সীর গুদুমাবৎ কার অবলম্বন করে আলাওল পদ্মাবতী কার রচনা করলেও এর পেছেন প্রধান উৎসাহ ছাড়া কে ছিলেন – তার পরিচয় দাও।

৩) আলাওলের রচিত কটি গ্রন্থের সমাধান পাওয়া যায়, তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোন্‌টি?

৩.৫ কাব্যের উৎস ঃ

আলাওল রচিত পদ্মাবতী কাব্যটি মৌলিক গ্রন্থ নয়। এটি অনুদিত গ্রন্থ। মহম্মদ জায়সীর হিন্দী ভাষায় লেখা পদুমাবৎ কাব্য থেকে এটা অনুবাদ করা হয়েছে। জায়সী যখন কাব্যটি লিখিত শেরশাহ তখন দিল্লীর সুলতান।

অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওল জায়সীর পদুমাবৎ কাব্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হুবহু অনুবাদ করেনি। তিনি মূল কাব্যের অনেক জায়গায় বর্জন করেছেন আবার কোথাও বা নতুন করে সংযোজন করেছেন।

কাহিনী সূত্রে – সূত্রের উল্লেখ করেছেন কিন্তু ঘটনার বর্ণনা ও সমারোহ বর্জন করেছেন। কাব্যের একেবারে শেষাংশ বাদে অধিকাংশ স্তবকই গুরুত্ব সহকারে হুবহু অনুবাদে করেছেন। সেদিক থেকে বলতে হয়, যথার্থ নিষ্ঠাবান অনুবাদকের মর্যাদা অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য। অবশ্য এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থের শেষাংশে এসে কবি আর জায়সীকে অনুসরণ করেন নি – স্বাধীন চিন্তার দ্বারা পরিকল্পিত হয়েছেন। সূচিত হয়েছে মূল কাব্যের সংগে অনুদিত গ্রন্থের পার্থক্য। কিন্তু তবু পদ্মাবতীর অনুবাদক হিসাবে আলাওলের মূল্যায়ন করতে হলে একথা অবশ্যই বলতে হবে যে মধ্যযুগে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে কবি আলাওলের মতো এমন একজন নিষ্ঠাবান অনুবাদক খুঁজে পাওয়া কষ্ঠকর।

৩.৬ কাব্যের কাহিনি ঃ

রোসাভ্ রাজসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল তাঁর পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরের নির্দেশ সপ্তদশ শতকে পদ্মাবতী কাব্যটি রচনা করেন। গ্রন্থটি একটি ইতিহাস ভিত্তিক কাহিনি কাব্যের

ভাবানুবাদরূপে রচিত। মূল কাব্যটি মালিক মহম্মদ জায়সী – রচিত হিন্দী পদুমাবৎ।

পদ্মাবতীতে কাহিনি রয়েছে দুটি অংশে। প্রথম অংশে চিতোর রাজ রত্নসেনের সংগে সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর বিবাহ এবং চিতোর প্রত্যাবর্তন কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আর কাহিনির দ্বিতীয় অংশে পাঠান–সম্রাট আলাউদ্দিন কর্তৃক পদ্মাবতীকে অধিগত করবার আকাঙ্খায় চিতোর আক্রমণ, যুদ্ধে আলাউদ্দিনের পরাজয় কিন্তু রত্নসেনের মৃত্যু এবং পদ্মাবতীর সহমরণ কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে।

টিপ্পনী

প্রথম কাহিনিটিতে আছে নাগমতি – পদ্মাবতী – রত্নসেনের নিলকান্ত কাহিনি যাতে প্রাধান্য পেয়েছে প্রেমের রোমান্স। আর অন্যটি হলো রত্নসেন – আলাউদ্দিন – পদ্মাবতীর ত্রিভূজ প্রেম, যাতে মূখ্য হয়েছে যুদ্ধের উত্তেজনা।

প্রথম কাহিনিটি হলো ঃ

সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর ছিল একটি শুকপাখি, নাম তার হীরামনি। একদিন সে বনের ভেতর পালাত গেলে এক ব্যাধের খপ্পরে পড়ল। ব্যাধটি পাখিটি বিক্রি করল এক বাম্মনকে। বাম্মন আবার চিতোরের রাজা রত্নসেনকে একলক্ষ স্বর্ণমূদ্রার বিনিময়ে পাখিটি বিক্রি করে ছিলেন। রাজা পাখিটির মুখে সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর রূপের প্রশংসা শুনে মুগ্ধ হয়ে সিংহল যাত্রা করলেন। সেখানে পদ্মাবতীকে দেখে রাজা একেবারে জ্ঞান হারালেন। এরপর অনেক পরীক্ষার পর রাজার যথার্থ পরিচয় পেয়ে চিতোর রাজা রত্নসেনের সংগে সিংহল রাজা গন্ধর্ব সেন তার কন্যা পদ্মাবতীর বিয়ে দিলেন। রত্নসেন পদ্মাবতীকে নিয়ে চিতোর ফিরে আসবার সময় সমুদ্রে পর্বে বিপর্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বহুকষ্টে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। প্রথমা স্ত্রী নাগমতি এবং দ্বিতীয়া স্ত্রী পদ্মাবতীকে নিয়ে রাজা রত্নসেন সুখেই দিন কাটাতে লাগলেন। পদ্মাবতী কাব্যের প্রথম কাহিনির মিলনাত্মক সমাপ্তি এখানেই।

দ্বিতীয় কাহিনি ঃ

রাজার সংগে প্রতারণা করার জন্য চিতোরের রাজসভা থেকে বিতাড়িত হল রাঘবচেতন। তারপর দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীনের কাছে গিয়ে পদ্মাবতীর সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করে রাঘবচেতন। সে কথা শুনে পদ্মাবতীকে পাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠলেন আলাউদ্দীন। তাই রত্নসেনের সংগে সংঘাত শুরু হলো। বছরের পর বছর চিতোর রাজ্য অবরোধ করে রাখলেন আলাউদ্দিন – কিন্তু পদ্মাবতীকে করায়ত্ত করতে না পেরে শুরু করলেন পাশা খেলা, তারপর রত্নসেনকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন রাজধানী। পদ্মাবতীর তৎপরতায় দুজন রাজপুত্র ঘোদ্ধা ছন্দবেশে দিল্লীতে গিয়ে রত্নসেনকে মুক্ত করে চিতোরে ফিরে এল।

এবার কুম্ভলজের রাজা দেবপালের সংগে রত্নসেনের সংঘাত শুরু হলে দেবপাল নিহত হলেন কিন্তু রত্নসেন আহত হয়েও চিতোর ফিরে এলেন। আহত অবস্থাতেই তিনি বেঁচে রইলেন আরো বেশ কিছু বছর। ইতিমধ্যে পদ্মাবতীও দুই পুত্রের জননী হলেন। চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন নামে ওই দুজনের ছেলের বয়স যখন সাত আর পাঁচ তখন মৃত্যু ঘটল রত্নসেনের। আর তার দুই স্ত্রী নাগমতি ও পদ্মাবতী স্বামীর চিতায় প্রবেশ করে সহমরণে গেলেন। চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন পিতার নির্দেশই দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীনের বশ্যতা স্বীকার করলেন। দ্বিতীয় কাহিনির সমাপ্তি

এখানেই।

৩.৭ পদ্মাবতী কাব্যের ভাষা ঃ

সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হলেন আলাওল। 'পদ্মাবতী' আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা। 'পদ্মাবতী' কাব্যটি মহম্মদ জায়সীর লেখা 'পুদমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ। অনুদিত গ্রন্থ হলেও এ কাব্য রচনায় আলাওলের অগাধ পান্ডিত্য অনস্বীকার্য।

টিপ্পনী

জায়সীর পদুমাবৎ কাব্যের ভাষা অবধী হিন্দী। সেখান থেকে অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওল হিন্দী ভাষাকে একেবারেই উপেক্ষা করতে পারেন নি, তাই কাব্যের মাঝে মাঝেই হিন্দী শব্দের ব্যবহার আমরা দেখি। তাছাড়া আরবী, ফারসী ভাষায় আলাওলের পান্ডিত্য থাকা সত্বেও যথাসম্ভব সে ভাষাও পরিহার করেছেন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি আলাওলের অনুরাগ ছিল। তাই সংস্কৃত তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন বেশী। উচ্চারণ ভঙ্গীতে বাঙালি উপভাষার নিদর্শন অনেক রয়েছে।

আঞ্চলিক উপভাষার লক্ষণ, যেমন –

অপিনিহিতি ঃ সত্য > সৈত্য, যক্ষ > যৈক্ষ, রক্ষক > রৈক্ষক প্রভৃতি

ও–কারের উ কার প্রবণতা ঃ কোকিল > কুকিল, মনোহর > মনুহর

উ–কারের ও–কার প্রবণতা ঃ পুস্তক > পোস্তক, সুন্দর > সোন্দর

মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে রূপান্তর ঃ ভিখারী > ভিকারি, পন্থ > পন্ত

'ড়' – সবসময়ই 'র' – তে পরিবর্তন ঃ বড় > বর। ঘোড়া > ঘোরা। বাড়িল > বারিল।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল 'শ' এর ব্যবহার। শ, স ও ষ ব্যবহার করেছেন ইচ্ছেমতো।

কর্তৃবাচক সর্বনাম, একবচন ঃ

আমি, আক্ষি, তুমি, তুক্ষি, আপনে, আপন

আত্মবাচক সর্বনাম, একবচন ঃ

আমাকে, আমারে, আমা, মোকে, মোরে, মোহকে

আলাওলের কাব্যে অন্ত্যমধ্যবাংলার বৈশিষ্ট্যরূপে নামধাতুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় প্রচুর। যেমন – নির্মিলা, আরম্ভিলা, বিবেদিলা, বিরোধিলা ইত্যাদি।

আরবী, ফারসী শব্দ একেবারেই ব্যবহার করেন নি, তা নয়। এ সব শব্দের নমুনা কিছু কিছু রয়েছে যেমন – আর্জি, কেচ্ছা, ইনাম, ছোলতান ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দের প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল বলেই ইসলামী শব্দ রেহেস্ত এর বদলে স্বর্গ এবং দোদ্ধখ্ এর পরিবর্তে নর্ক বা নরক লিখেছেন আর কৌরাণ এর বদলে লিখেছেন 'পুরাণ'। জায়সীর মতো হিন্দী শব্দের ব্যবহারও রয়েছে অনেক। জায়সীর ব্যবহৃত কিছু হিন্দী শব্দই লক্ষ্য

টিপ্পনী

করা যায় আলোওলের রচনায়। যেমন –

সমুদ্রের নাম – কিলকিলা। ডাক – ফুকার। ফলবিশেষ – ফিরিনি, বড়হারা। রত্ন – নাগ, গবি – কুতিজ্ঞ। খোলা – উতারিয়া। পায়রা – পরেওয়া।

আলাওল বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা যেমন ব্যবহার করেছেন তেমনি অদ্যভাষাদর্শন লক্ষ্য করা যায় তাঁর লেখায়। বিশেষ করে গীতি রক্তদার সময় বাংলা ভাষার সংগে মিশ্র সংস্কৃত এমন কি বজবুলির ব্যবহারও করেছেন তিনি। গানের ভাষা কখনও ধ্বনিঝংকার হয়ে উঠেছে। গান রচনায় ভাষার দিক থেকে কখনও চন্ডীদাস অথবা বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করেছেন। তবে এ কথা বলতেই হবে আলাওলের ভাষায় ছিল তাঁর নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গী যেখানে বঙ্গীয় বাকধারা শ্বতন্ত্র এক রূপকল্প নির্মাণ কবে কবিকে মর্যাদা দিয়েছে যথার্থ এক ভাষা শিল্পী হিসাবে।

পদ্মাবতীর ছন্দ ঃ

‘প্রথমে প্রণান করি এক করতান। যে
ই প্রভু জীবদানে সৃজিলা সংসার।।’

আলাওলের পদ্মাবতী পাঁচালী জাতীয় রচনা। কবির কাব্যে বর্ণনামূলক পয়ারই বেশী। চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত বা তান প্রধান ছন্দে রচিত।

ডান প্রধান ছন্দের ত্রিপদী রীতিতে লঘু ত্রিপদী (৬ + ৬ + ৮) ২০ মাত্রার চরণ এবং নুরু ত্রিপদীতে (৮ + ৮ + ১০) ২৬ মাত্রার চরণও তিনি রচনা করেছেন।

লঘু ত্রিপদী ঃ

গড়ের উপরে কিসের অন্তরে
যাইতে চাহ যোগীরাজ।
এখাত রহন কোন প্রয়োজন
কিবা মনে চিন্ত কাজ।।
(রাজা–গড় আক্রমণ খন্ড থেকে)

গুরু ত্রিপদী ঃ

না হৈল কাটাসিদ্ধি বঞ্চিত হইল বিধি
লাজ হেতু না কেঁলু প্রচার।
জীবন তথাত থুইয়া শূন্য অবচয় লইয়া
চলি আইলুঁ গৃহে আপনার।।
(রাজা–গড় আক্রমণ খন্ড যেতে)

মালিনী ছন্দের নিদর্শন ঃ

সখী বলে শুন সুবদনী।
স্বামী তোর মহা গুনী জ্ঞানী।।
তোমা সমরি আসিব আপনি।

মৈলে দরশন নাহি পুনি।।
(নাগমতির বিলাপ থেকে)

সংস্কৃত ছন্দের মধ্যে ভূজঙ্গ প্রয়াতের নিদর্শন ঃ

অতি অপবিত্র অসতী চরিত্র
অহিত সে পাত্র কদাচ না মিত্র।
উদ্ধারয় সাধু গুনিগন বন্ধু।
শ্রীযুক্ত মাগন ক্ষমা সত্যসিন্ধু।।
(দেবপাল - দূতী খন্ড থেকে)

বাংলা এবং ব্রজবুলি উভয় পদেই ধ্বনিপ্রধান ছন্দের বিন্যাস ঃ

রসিক বর সুজান
রূপে জিনি পঞ্চবান।
শ্রীযুত মাগন আবত্রি কারন
হীন আলাওল ভান।।
(চিতোর আগমন খন্ড থেকে)

ছয়মাত্রার ধ্বনি প্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ঃ

ওহ বড়ি বৈটা কটিল কুলটা
পাপ কুবচন শুনায় সে রে।
গরল গারি কুল মহাকারি
ধিক ধিক সরাও অচিরে।।
(দেবপাল-দূতী খন্ড থেকে)

সাতমাত্রার ধ্বনি প্রধান ছন্দ ঃ

গগনে গরজে যেন সখন ঘন ঘন
চৌদিগে নীরদ সুরে রে।
বরফে ঝর ঝর বহয় দর দর
হলাহল সত্বর উরে রে।।
(দেবপাল-দূতী খন্ড থেকে)

আট মাত্রার ধ্বনি প্রধান ছন্দ ঃ

চন্দন শীতল মলয়ানিল ছল
সৌরভ বিশিথ খরতর লাগে।
ভ্রমর কোকিল রব শুনত পরাভব

টিপ্পনী

মন্মথ-বাণ আনল উরে জাগে।।
(পদ্মাবতী - রত্নসেন ভেঁটখন্ড থেকে)

তানবধান একাবলী ছন্দ (৬ + ৫ মাত্রা) ঃ

দশন মুকুতা বিজুলি হাস।
অমিয়া বরিষে মধুর ভাষ।।
উরজ কঠিন হেম কটোর।
হেরি মুনিজন মন বিভোর।।
(পদ্মাবতী রূপচর্চা খন্ড থেকে)

টিপ্পনী

তানপ্রধান ছন্দের লঘুচালের লঘু ত্রিপদী ছন্দ ঃ

নাসা সুললিত করি চঞ্চু জিত
সুচারু বেসর রাজে।
তড়িত জড়িত তারক ললিত
দেখিল চান্দের মাঝে।।
(রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ খন্ড থেকে)

আলাওলের 'পদ্মাবতী' পাঁচালী জাতীয় রচনা। জায়সী পদুমাবৎ কাব্য লিখেছিলেন অবধী হিন্দী কাব্যের ধারা অনুযায়ী। আলাওল 'পদুমাবৎ' কাব্যটির বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে মধ্যয়গের বাংলা পাঁচালী রীতিই বেছে নিয়েছেন। বর্ণনামূলক পয়ার গীতাক লাচাড়ি এবং সঙ্গীতময় পদরীতির ত্রিবিধ প্রয়োগে আলাওল তাঁর কাব্যে এনেছেন ছন্দের নানা বৈচিত্র্য। ছন্দ নির্মাণে এবং তার বৈচিত্র্য সাধনে কবি আলাওলের অসাধারণ প্রতিভা ছিল - এ কথা অনস্বীকার্য।

৩.৮ পদ্মাবতী কাব্যে সঙ্গীত ঃ

সৈয়দ আলাওল ছিলেন মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'পদ্মাবতী' কাব্যটি জায়সীর লেখা 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ। এ কাহিনিতে রয়েছে দুটি উপখ্যান। একটি রত্নসেন - নাগমতি - পদ্মাবতীর প্রনয় কাহিনি, আর একটি আলাউদ্দীন - রত্নসেন - পদ্মাবতীর প্রেম কাহিনি। আলাওল কেবল প্রতিভাশালী কবিই ছিলেন না - তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের সঙ্গীতজ্ঞ। রাজসভার সভাসদের উপস্থিতিতে তিনি নানা সময়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। শোনা যায় অনেক সভাসদ এমন কি মাগনেরও সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন তিনি।

রাজসভায় কেবল সঙ্গীতের একজন দক্ষ শিল্পী ছিলেন তাই নয়, সঙ্গীত রচনাতেও তার পারদর্শিতার নজির রয়েছে পদ্মাবতী কাব্যে। এমন কি ও কাব্যের দু একটি জায়গায় সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনাও করেছেন তিনি। শাস্ত্রতত্ত্ব খন্ডে এবং রাজা-বাদশাহ যুদ্ধ খন্ডে সে আলোচনার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় ঘটে।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

কেবল একটি বা দুটি নয়, সমগ্র পদ্মাবতী কাব্যে আলাওল রচিত তেরোটি পদগানের সন্ধান আমরা পাই। পাঁচালী রীতির আদর্শেই 'পদ্মাবতী' কাব্যটি রচিত। তিন ধরণের রচনাংশ থাকত

এই পাঁচালী রীতিতে।

এক – বর্ণনামূলক পয়ার। দুই – গীতাত্মক লাচাড়ি। তিন – সঙ্গীতময় পদগীতি। গানের উপযোগী অংশই ছিল বর্ণনামূলক পয়ারে। গীতাত্মক লাচাড়ি হল প্রধানত বাগযুক্ত দ্বিপদী বা ত্রিপদী গীত। আর তালে এবং রাগে গেয় পদগুলো হলো সঙ্গীতময় গেয় পদ।

'পদ্মাবতী' কাব্যের 'শুক' খন্ড থেকে শুরু করে 'পদ্মাবতী রূপচর্চা' খন্ড – অর্থাৎ এই নয়টি খন্ডেই একটি করে গান তিনি লিখেছেন। এ ছাড়া 'দেবপাল দূতী' খন্ডে রয়েছে চারটি গানের নিদর্শন।

টিপ্পনী

ভনিতায় আলোওল প্রায়ই বলেছেন, –

'পয়ার রচিয়া কহে হীন আলোওল।'

দীর্ঘ ছন্দের লাচাড়ি লিখবার সময়েও তাঁর ভনিতা –

সদগুণ মাগন নাম রোসাঙ্গেত অনুপাম
আলাওলে পুনিয়া আরতি।
ভাঙ্গিয়া চৌপাই ছন্দ রচিল পয়ার বন্ধ
পদে পদে অমৃত ভারতী।।
(পদ্মাবতী শুক মিলন খন্ড)

বাংলা, সংস্কৃত এবং বজবুলি – তিন রকম ভাষাতেই আলাওল পদগুলো রচনা করেছেন। কিছু গান আবার তৎসম শব্দে ভরপুর। যেমন –

মদন ধনুক ভুরু বিভঙ্গ।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে বাণ রঙ্গ।।
নাসা যগপতি নহে সমতুল।
সুবঙ্গ অধর বান্ধুলি ফুল।।
নাসা যগপতি নহে সমতুল।
সুরঙ্গ অধর বান্ধুলি ফুল।।
(পদ্মাবতী রূপচর্চা খন্ড)

কবি জয়দেবের ভাষাভঙ্গীর অনুকরণ লক্ষ্য করা যায় কয়েকটি পদে, যেমন –
বসন্তে নাগরব নাগরী বিলাসে।

বরবালা মুখ ইন্দু স্রবে সুধা বিন্দু বিন্দু
মৃদুমন্দ ললিত অধর মধুহাসে।।
প্রফুল্লিত কুসুম মধুবত ঝঙ্কৃত
হুঙ্কৃত পরভৃত কুজিত রাবে।
মলয়া সমীর সুসৌরভে সুশীতল
বিলুলিত পতি অতি রসভাবে।।
(ষট্ ঋতু বর্ণন খন্ড)

টিপ্পনী

বিদ্যাপতির ভাবোল্লাস পদের প্রভাব কবি আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে –

আজি সুখের নাহি ওর
আনন্দে মন বিভোর।
চিরপতি আশে চিত্তের মানসে
নাগর সদনে মোর।। ধুয়া।
(চিতোর আগমন খন্ড)

আলাওল আবার বাংলা ভাষাতেই কিছু গান লিখেছেন। পড়তে পড়তে আমাদের চন্ডীদাসের কথা মনে পড়ে যায়। চন্ডীদাসের মতো সহজ সরল ভাষায় রচিত সে পদগুলো। যেমন –

পূর্বজন্মে মহাতপ কৈলু।
তার ফলে হেন স্বামী পাইলু।।
রিষভাবে পাছে না চাহিলু।
নিজ দোষে রত্ন হারাইলু।।
হেন স্বামী ছাড়ি জায় যার।
কি ফল জীবন সুখ তার।।
(নাগমতি বিলাপ)

ব্রজবুলিতে লেখা একাধিক পদ লক্ষ্য করা যায় পদ্মাবতী কাব্যে। পড়তে পড়তে গোবিন্দদাসের 'পূর্বরাগ' পদের কথাই আমাদের মনে এসে যায়, যেমন –

চন্দন শীতল মলয়ানিল ছল
সৌরভ বিশিথ খরতর লাগে।
ভ্রমর কোকিল রব শুনত পবাভব
মন্মর্থ-বাণ আনল উর জাগে।।
কিঞ্চিত প্রাণ আছয় ঘটে ধুক ধুক
তুয়া আশ্বাস বচন বিসোআসে।
শ্রীযুত মাগন রসিক সুনায়ক
আরতি হীন আলাওল ভাষে।।
(পদ্মাবতী-রত্নসেন ভেঁটখন্ড)

বাংলা ভাষায় রচিত ভাটিয়ালি গানের একটি দীর্ঘ ত্রিপদী –

ভুলিয়া সংসার পাশে বন্দী হৈল মায়া ফাঁসে
না ভজিলু তোমার চরণে।।
এবে ত্রিজগত সাঞি তুমি বিনে গতি নাই
তরাও আপনা নাম গুনে।
(পদ্মা-সমুদ্র খন্ড)

আলাওলের গীত রচনার অপূর্ব নিদর্শন আরও অনেক পদেই আমরা দেখাতে পাই। আলঙ্কারিক রূপ বর্ণনার সংগে যেখানে রয়েছে সালঙ্করা ভাষাভঙ্গী। পদাবলীর প্রভাবও রয়েছে এখানে –

চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী
খঞ্জন গঞ্জন শোভিতা।
কিঙ্কিনী ঘুঁথর বাজয় ঝাঁঝর
ঝনাঝন নেপুর মধুর গীতা।।
ভুরু বিভঙ্গ মন্মথ – মন – মোহিতা।। (ধুয়া)
কুটিল কেশ কুসুম সুবেশ
সিন্দুর চন্দন তিলক তথা।
(রত্নসেন – পদ্মাবতী বিবাহ–খন্ড)

আলাওলের রচিত গানগুলিতে ধ্রুবপদসহ চার অথবা পাঁচটি করে স্তবক রয়েছে। উদগ্রাহ স্তবক দিয়ে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ভনিতায়। আর প্রত্যেক গানের মাথায় রাগের বাস আছে, কখনও কখনও ছন্দের ও তালেরও উল্লেখ করেছেন তিনি। আলাওল পাঁচালীর একঘেয়ে রীতির মধ্যে মাঝে মাঝে গীত রচনা করে আঙ্গিক বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন – এবং রাগচিহ্নিত সেই পদগুলি পড়লেই বোঝা যায়। এই মৌলিক পদ গানগুলিই এ কাব্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি আলাওল যে যথার্থই একজন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন – একথা অনস্বীকার্য্য।

৩.৯ পদ্মাবতী কাব্যে সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ

আলাওলের পদ্মাবতী কাব্য জায়সীর পদুমাবৎ কাব্যের অনুবাদ। জায়সী পদুমাবৎ কাব্যটি লিখেছিলেন ১৫৪০ খীষ্টাব্দে। এর একশ বছর পর ১৬৪০ খীষ্টাব্দে আলাওল রচনা করেন পদ্মাবতী। অনুদিত গ্রন্থ হলেও আলাওল অনেক জায়গাতেই মূল গ্রন্থকে অনুসরণ করেন নি, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কাহিনিটি এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

পদ্মাবতী কাব্যে সমকালীন বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়, শুধু তাই নয় তৎকালীন আরাকান রাজ্য সম্পর্কেও আমরা অনেক তথ্যের সন্ধান পাই। বানিজ্য কেন্দ্র ছিল আরাকান তাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন মানুষের সমাগম ছিল সেখানে। আরব, মিশরী, তুর্কি, হাবশী, রুমী, খোরসানী, লাহোরী, কাশ্মীরী, বাঙালি, মোগল, পাঠান প্রভৃতি অনেক দেশের বিচিত্র মানুষেরই উল্লেখ আছে। এছাড়া ইংরেজ ওলন্দাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ ইত্যাদি দেশ থেকেও বহু মানুষ এসে রোসাতনগরীকে করে তুলেছিল এক বহু জাতিক নগর।

সে যুগে রাজাই ছিলেন সমাজের মাথা। রাজাকে ঘিরেই বিরাজ করত অভিজাত মন্ডলী এবং সমাজের অন্যান্য মানব সমাজ। সমাজ ছিল সামন্ত্রতান্ত্রিক। আলাওলও ছিলেন সেই সমাজেরই একজন। রাজার সভাসদরাই তাই।

পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণ হিন্দু নিয়ত। তাদের অত্যাচারে মানুষের জীবন প্রায় দুবির্ষহ

টিপ্পনী

ছিল। কবিও এদের আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। নানা ধরনের নৌকার প্রচলন ছিল। শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ছিল বাংলা, আরবী, হিন্দী, মর্গী প্রভৃতি নানা ভাষার প্রচলন। নাচ গানের চর্চা হতো। রাজার পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরের অনেক শাস্ত্রেই পান্ডিত্য ছিল। কাব্য, সঙ্গীত, নাটক, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর দখল ছিল অগাধ।

রাজার সভাসদরাও ছিলেন সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে। তারা যুদ্ধবিদ্যায় যেমন পারদর্শী ছিলেন, কাব্য চর্চাতেও ছিলেন সমান আগ্রহী। তবে এরা ছিলেন সুবিধাভোগী। প্রেমের কাহিনি বা যুদ্ধের কাহিনিতে এদের মন আকৃষ্ট হতো বেশী। পদ্মাবতী কাব্যে এই সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজের ছবিই ফুটে উঠেছে। একেবারে নিচের তলার মানুষ অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের পরিচয় নেই এ কাব্যে। কাব্যটি হয়ে উঠেছে অভিজাত সমাজের জীবন যাত্রা প্রণালী।

টিপ্পনী

আলাওল মুসলমান কবি। কিন্তু মুসলমান সমাজ জীবন এখানে অনুপস্থিত বললেই চলে। হিন্দু জীবন যাত্রার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন কবি। সমগ্র কাহিনিটিকে দুটো অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমটি রাজা রত্নসেন – নাগমতি – পদ্মাবতীর প্রণয় কাহিনি আর দ্বিতীয়টি হলো আলাউদ্দিন – রত্নসেন – পদ্মাবতীর প্রেমকাহিনি। এই দুটো কাহিনির মধ্যেই মুসলিম সমাজের তথ্য ও উপকরণের খুবই অভাব।

শুধু তাই নয়, জায়সীর কাব্যে চিতোর সুলতান কর্তৃক অধিকৃত হয়েছে – আলাওলের কাব্যে আমরা শেষ পর্যন্ত দেখি হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে সহৃদয়তা ও সম্ভাব। রত্নসেনের দেহ ত্যাগের পর তার পুত্রদের পিতার দেহ সংস্কারের যে বর্ণনা এ কাব্যে পাওয়া যায় তা জায়সীর কাব্যে নেই। আলাওল হিন্দু ক্রিয়াকর্মের পরিচয় দিয়েছেন – এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতাও আমাদের বিস্ময় জাগায়।

আলাওল পদ্মাবতীর বিবাহের বর্ণনা করতে গিয়েও বঙ্গীয় সমাজ ও তার প্রথাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। বিবাহের বর্ণনায় গাত্রহরিদ্রা, নান্দীমুখ, শুভদৃষ্টি, সম্প্রদান প্রভৃতির বর্ণনার মাধ্যমে আলাওল বঙ্গীয় সমাজের ব্যবস্থাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। সঙ্গীত শাস্ত্র অনুযায়ী ধ্রুপদী নাচগানের কথা যেমন রয়েছে তেমনি বঙ্গীয় কীর্তনও উল্লিখিত হয়েছে। বিষ্ণুপদের উল্লেখও আমরা পাই। সিংহলের হাট বর্ণনার সময় অনেক পণ্যেরই উল্লেখ করেছেন কবি – যা আমাদের বঙ্গীয় সমাজে মেলে। পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনায় নানা রকম বসনের উল্লেখ করেছেন যেগুলো সে যুগে অভিজাত সমাজে ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় – এ ছাড়া নারীর ব্যবহৃত নানা ধরনের অলঙ্কার –এর উল্লেখও আমরা দেখি। বাদশাহ আক্রমণ খন্ডে চিতোর রাজ প্রসঙ্গে সুলতানের মন্তব্য। 'পিপীলিকা পাখা হয়' 'মরিবার কালে' একেবারে বঙ্গীয় প্রবচনের অন্তর্গত।

অনুবাদকে উপেক্ষা করে যেখানে আলাওলের একেবারে নিজস্ব রচনা সেখানে সমকালীন সমাজ জীবনের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। বঙ্গীয় সংস্কৃতির পরিচয়ও আমরা দেখতে পাই। সিংহলের হিন্দু রাজপ্রসাদ বর্ণনায়, জলাশয় – পশুপাখী, গাছ, ফল – ফুল বা হাটবাজারের বিবরণে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির ছাপ খুবই স্পষ্ট হয়েছে।

পদ্মাবতী কাব্যে সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় উদ্ঘাটন করতে গিয়ে কবি আলাওলের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব অবশ্যই আমাদের নজর এড়ায়না। তিনি এ কাব্যে যেমন সমকালীন রাজপুত্র সামাজিক প্রথার বিশ্লেষণ করেছেন তেমনি পদ্মাবতী – রত্নসেন বিবাহ খন্ডে হিন্দু বিবাহ ও বঙ্গীয় লোকাচারের

বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। সেকালের আরাকান রাজ্য সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য অবগত হতে পারি।

মাগন পরিচিতি ঃ

'মান্যের মা-কার আর গুরুর গ-কার।
শুভযোগে নক্ষত্রের আনিল ন-কার।।'
(মাগন প্রশস্তি)

টিপ্পনী

কবি আলাওল মাগন নামের ব্যুৎপত্তি সন্ধান করতে গিয়ে পদ্যাবতী কাব্যে মাগন প্রশস্তি অংশে এই মন্তব্য করেছেন। ম-গণকে সম্পদের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলা হয়। মাগন সম্পদের সেই অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে অবস্থান করে সকলের মঙ্গল বিধান করেছেন।
মাগন সম্পর্কে কবি আরও বলেছেন ঃ

শুদ্ধভাব সদাচার মধুর আলাপ।
না জানন্ত কৃপণতা অকর্মকলাপ।।
পর উপকারী অতি দয়াল হৃদয়।
হিংসা করি না করেন্ত লোক অপচয়।।

সিদ্দিকী গোত্রভূক্ত মুসলমানধর্ম বিশ্বাসী মাগনের জন্ম সম্ভবত চট্টগ্রামে। তিনি ছিলেন রোসাঙ্গ রাজা নরপদিগ্যির বিশ্বাসভাজক এক মন্ত্রী। রাজ সৈন্য বিভাগের মন্ত্রী বড় ঠাকুরের পুত্র হলেন মাগন। তিন পুরুষ ধরেই আরাকান রাজপরিবারে মাগনের প্রভুত্ব ছিল। আলাওলকে তিনিই আমাত্য সভায় নিয়ে আসেন।

মাগন অত্যন্ত শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন – তিনি নিছক বিদ্যোৎসাহী নন, বহু ভাষাবিদ হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা। নাচ গানেও তাঁর খ্যাতি ছিল। অনেকেই মনে করেন আলাওলই ছিলেন তাঁর সঙ্গীতগুরু। তিনি যেমন অগাধ বিষয় সম্পত্তির অধিকারী তেমনি ব্যক্তি চরিত্রের নানা গুণাবলীর জন্য সমকালীন সমাজ প্রশংসাও পেয়েছেন অকুণ্ঠ।

বাংলা, আরবী, ফারসী, মগী এবং হিন্দী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। অত্যন্ত পরোপকারী ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন পরিচিত, সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁর নিবিড় আত্মিক যোগ। শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষের সঙ্গেই তাঁর ছিল সুসম্পর্ক। আর আলাওলও পদ্মাবতী কাব্যের অনেক খন্ডেই ভণিতা অংশে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন তাঁর। কেবল স্বভাবই নয়, তাঁর রূপের প্রশস্তি করতেও আলাওল দ্বিধা করেন নি। তাঁর দেহ ছিল দুধান্দল শ্যাম, মাথায় থাকত মগধ দেশীয় সাদা পাগড়ী। ভেষজ ও যাদুবিদ্যাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

পরোপকারী মাগন-এর অকুণ্ঠ দানের পরিচয় পেয়েই আলাওল লিখলেন,

মহাদানী মহামানী মহাসাহসিক।
অহিংসক আপ্তশূন্য মর্যাদা অধিক।।

কেবল দানশীল নয়, তিনি কাব্যরসিকত্ত ছিলেন। কবি তাই রত্নসেন – পদ্মাবতী বিবাহ খন্ডে ভণিতায় উল্লেখ করেছেন ঃ

টিপ্পনী

শ্রীযুত মাগন বীর কাব্যরসে অতি ধীর
ত্রিভূবনে নবরসেজ্ঞাতা।
যার মনে যেই বাঞ্ছা পুরায়ন্ত সেই ইচ্ছা
কলিকালে বলিসম দাতা।।
তাহান আরতি ধরি মনেত সাহস করি
বিরচিল সরস পয়ার।
হীন আলাওল ভণে মিনতি পন্ডিত স্থানে
টুটা হইলে শুধিয় অক্ষর।।

মাগন নিজেও ছিলেন কবি। আলাওলের লেখার ভেতর সে তথ্যও রয়েছে। কবি মাগন রচিত চন্দ্রাবতী কাব্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন,

কবি আলাওলে মধুর গায়।
মাগন কবিকৃতি বহু সদায়।।

সবশেষে বলতে হয়, ভুলে গেলে চলবে না যে রোসাঙ্ রাজসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল তাঁর পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরের নির্দেশেই সপ্তদশ শতকে পদ্মাবতী কাব্যটি লিখেছিলেন।

৩.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী ঃ

১) সপ্তদশ শতকে মুসলমান মহাকবি আলাওলের সাহিত্য কীর্তির পরিচয় দাও।

২) সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকান রাজসভার কবি আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের উৎস ও কাহিনি বিশ্লেষণ করো।

৩) রোসাঙ্ রাজসভার কবি আলাওলের কাব্য প্রতিভার পরিচয় দাও।

৪) সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির কী পরিচয় পাওয়া যায় – বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করো।

৫) মাগন ঠাকুর কে? পদ্মাবতী কাব্য থেকে মাগন ঠাকুর সম্পর্কে যা জানা যায় বিস্তারিত আলোচনা করো।

৬) আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের গীতিধর্মীতা বিষয়ে সংক্ষেপে একটি প্রবন্ধ রচনা করো।

৭) পদ্মাবতী কাব্যে ভাষা, ছন্দ এবং অলঙ্কার নির্মানে আলাওলের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৩.১১ সহায়ক গ্রন্থ ঃ

পদ্মাবতী – সম্পাদনা ঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, –পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ।

চতুর্থ অধ্যায়

ময়মনসিংহ - গীতিকা

৪.০ ভূমিকা।

৪.১ উদ্দেশ্য।

৪.২ গীতিকার ধারণা ও মৈমনসিংহ গীতিকা।

৪.৩ ময়মনসিংহ গীতিকার সৃষ্টি, শ্রষ্ঠা ও সংগ্রাহক।

৪.৪ আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন।

৪.৫ ময়মনসিংহ গীতিকায় সমাজভাবনা।

৪.৬ মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ময়মনসিং গীতিকা।

৪.৭ নির্বাচিত গীতিকার সাধারণ পরিচয়।

৪.৮ ময়মনসিংহ গীতিকার কাব্য সম্পদ।

৪.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলী।

৪.১০ সহায়ক গ্রন্থাবলী।

টিপ্পনী

৪.০ ভূমিকা ঃ

মৈমন সিংহ গীতিকা (ময়মন সিংহ) গুলি মূলত পল্লী গীতিকা। নিরক্ষর বা গ্রামীন স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তি জনশ্রুতিমূলক লৌকিক কাহিনীগুলির শ্রষ্ঠা। এই পালাগান গুলি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত। মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকার পালাগান গুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় - ক) লৌকিক প্রণয় গাথা, খ) ঐতিহাসিক রোমান্টিক আখ্যান, গ) ঐতিহাসিক আখ্যান। মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে মৈমনসিংহ গীতিকা গুলি পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনপ্রিয়তার শিখর স্পর্শ করেছিল। পালাগানগুলি পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের প্রাণের কাছাকাছি পৌঁছেছিল পালাগানগুলির নাম ও বিষয়বস্তু ও তার রসাবেদন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জনপ্রিয় পালাগুলি হল - মহুয়া, মলুয়া, কঙ্ক ও লীলা, কমলা। চন্দ্রাবতী, দেওয়ানভাবনা, কাজল রেখা, মৈমন সিংহ গীতিকাগুলির চরিত্র খুবই জীবন্ত বলে মনে হয় তবে নায়িকা চরিত্রের সমস্ত তিত্ব দ্বন্দ্ব বেশি করে দুলে ওঠে। গীতিকাগুলির মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলনের ছাপ সুস্পষ্ট। পল্লী কবিগণ প্রকৃতিকে নির্ভর করে নায়ক নায়িকার প্রেমের আলেখ্য সাজিয়েছেন, যেখানে প্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের কোন ব্যবধান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

৪.১ উদ্দেশ্য ঃ

মৈমন সিংহ গীতিকা গুলি গ্রামীন কবিদের লৌকিক কাহিনী। তাই সোঁদা মাটির ঘাণ মাখানো গীতিকাগুলি লোক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মধ্য যুগে যেখানে কানুছাড়া গীত নাই এমন এক যুগের অন্তিম মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এখ অসাশ্রদায়িক মানব জীবন নির্ভর সাহিত্যের জন্ম। ধর্মান্ধ মধ্যযুগে জীবন নির্ভর রচনা অতিসাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরত তার প্রমাণ আমরা পেলাম। এমন ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই করিয়া রচনা করে থাকতে পারেন। রচনা গুলি তৎশলীন পূর্ববঙ্গের সমাজ-সংসার, ইতিহাস, মানব-মানবীর রোমান্টিক প্রণয়ে ত্যাগ-তিতিক্ষা, প্রতিহিংসা, নাটকীয়তা স্থান পেয়েছে। নারীর আত্মত্যাগ, মানুষের কামলোলুপ্তা, ভ্রষ্টাচার দুর্ভিক্ষ, নদ-নদী, নৌযাত্রা, শাসন, শোষণ, রাষ্ট্রীয় পীড়নের দিকটি ও কবিরা আখ্যানে স্থান দিয়েছেন। তাদের মুখের ভাষা, শব্দযোজনা, আঞ্চলিক মনস্তত্ত্বের ব্যাপক প্রতিফল গীতিকা গুলিকে আধুনিক কাব্যের সমতুল করে তুলেছে। 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'র ভূমিকায় সুখময় মুখোপাধ্যায় জানালেন - 'মানুষের নানা অনুভূতি ও প্রবৃত্তিও এই গীতিকাগুলিতে সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করেছি। রূপমোহ, অন্তরের আলোড়ন, মিলনের আকুতি, বিরহের জ্বালা এবং বিদায়ের হাহাকার - সমস্ত কিছুকেই কবিরা আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে জীবন্ত করে তুলেছেন। এই সব ভাবের বর্ণনায় যেমন তাঁদের কবিত্ব শক্তির নিদর্শন মেলে, অপর দিকে তেমনি জীবন সম্বন্ধে তাঁদের গভীর ও বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যায়।'

টিপ্পনী

৪.২ গীতিকার ধারণা ও মৈমন সিংহ গীতিকা ঃ

মধ্যযুগে বাংলায় লোক মুখে সৃষ্ট ও প্রচলিত আখ্যানধর্মী গীতিকেই আমরা গীতিকা, পালাগান, লোকগাথা, পল্লীগান হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। আমাদের গীতিকার সঙ্গে পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনা প্রসূত Ballad এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

'মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে এক ধরণের আখ্যানমূলক লোকগীতি প্রচলিত ছিল ইংরাজীতে তাকেই Ballad বলা হত।'

('ময়মন সিংহ-গীতিকা', সুখময় মুখোপাধ্যায়)

Ballad -

- 'A sentimet and simple narrative song.'
- 'A song or poem that tells a story or (in popular music) a slow love song.'

Ballad লোকমুখে সৃষ্টি ও প্রসারিত এক জাতীয় নৃত্যগীত সম্পৃক্ত নাট্যধর্মী কাহিনীকাব্য। দীনেশচন্দ্র সেন 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র ইংরেজী অনুবাদ করেন 'Eastern Bengali Ballads Mymensingh' নামে। পাশ্চাত্য Ballad এবং আমাদের গীতিকার, বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনামূলক আলোচনায় বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

- Ballad আখ্যানমূলক ও সংহত গীতিকার কাহিনীর শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়, সঙ্গে

শাখা কাহিনী অপ্রতুল নয়।

- Ballad লোকমুখে সৃষ্টি ও প্রসার এবং সংগীত প্রধান। গীতিকার বিষয় লোকজীবন সংলগ্ন, বর্ণনা প্রধান আখ্যান।
- Ballad এর আনুপুর্বিক বহুল বিবরণ বর্জিত এবং ঘটনা প্রধান গীতিকার রোমান্স এবং নাটকীয়তা দেখা যায়।
- Ballad সবসময় ছন্দোবদ্ধ, গীতিকা রোমহর্ষক কাহিনী লক্ষ্য করা গেলে ও সব সময় নয় এটি কাহিনী প্রধান রচনা।
- Ballad এর বিষয় বৈচিত্র্যপূর্ণ, রোমহর্ষক ঘটনা যুক্ত। গীতিকা সবসময় রোমহর্ষক নয় এতে রচয়িতার ব্যক্তি অনুভূতির প্রাধান্য লক্ষিত হয়।
- Ballad এ পরিণতি নাটকীয় এবং ঘটনা পরম্পরার তীবতা নাটকীয় গতি আনে। গীতিকা গ্রামীন লৌকিক আখ্যান হলেও ছোট গল্পধর্মী।

টিপ্পনী

বাংলা গীতিকাগুলির মতো ব্যালাড গীত হবার উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্টি হয়েছিল তবে তা কখনো বা নৃত্যযোগে পরিবেশিত হয়। 'ব্যালাডের অন্যতম প্রধান লক্ষণ যে আখ্যান ধর্মিতা তা ময়মন সিংহ গীতিকার প্রতিটি পালাতেই আছে - 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী', কঙ্ক ও লীলা - প্রতিটি পালাই স্বতন্ত্র কাহিনীর আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে। এই সব প্রেম কাহিনী বাস্তব ঘটনা আশ্রয়ে রচিত। সে ঘটনা পুরোপুরি ঐতিহাসিক না হতে পারে কিছুটা ইতিহাস কিছু বা কিংবদন্তীর আশ্রয়ে লোকের মুখে মুখে রচিত হয়েছে। গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বিষয়বস্তু অবলম্বনে মানুষের চিরকালের প্রেম-ভালোবাসা, সুখ-দুঃখের প্রেরণায় লেখা এই গীতিকাগুলিতে বেছে উঠেছে বিশ্বসাহিত্যের সুর।'

৪.৩ মৈমন সিংহ গীতিকার সৃষ্টি, শ্রষ্টা ও সংগ্রাহক ঃ

মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি লোক প্রচলিত মৌখিক সাহিত্যের আকারে সমাজে জনপ্রিয় ছিল। এর আখ্যান বাংলার পল্লী জীবনের প্রাণের সম্পদ। সুশীল সমাজে এর পরিচয় ছিল না সাহিত্য রসিক ড. দীনেশ চন্দ্র সেন এই গীতিকাগুলির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ বিস্মিত হন। এমন সাহিত্য সম্পদ গ্রাম বাংলার বুকে লুকিয়ে আছে যা বিশ্বসাহিত্যের সমতুল। এ গুলির সংগ্রাহক হিসাবে চন্দ্রকুমার দে মহাশয়কে দায়িত্ব তুলে দেন দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়। অন্যান্য যে ব্যক্তিগণ গীতি সংগ্রহে সহায়তা করেছিলেন তারা হলেন - বিহারীলাল সরকার, আশুতোষ চৌধুরী, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, কবি জসিমুদ্দিন, মনোরঞ্জন চৌধুরী।

গীতিকাগুলি সংগ্রহের পর ১৯২৩ থেকে ১৯৩২ খীষ্টাব্দের মধ্যে 'ময়মন সিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে দুটি গ্রন্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন যার গদ্যানুবাদ করেছিলেন। ইংরেজি অনুবাদ- 'Eastern Bengali Ballads - Mymen Singh'।

মৈমন সিংহ গীতিকার উদ্ভব এবং বিস্তার অবিভক্ত বাংলার মৈমনসিংহ অঞ্চল। এখানে হাজং নামে আদিবাসী সম্প্রদায়ে বাস। এই হাজং সম্প্রদায় ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার

অন্তর্ভুক্ত।এরা ইন্দো-মোঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।স্বাভাবিকভাবেই এই সমাজে নারী স্বাধীনতা ছিল তাই গীতিকাগুলির নারীদের সক্রিয়তা চোখে পড়ে। মৈমনসিংহ গীতিকায় মাতৃতান্ত্রিক হাজং প্রভাব নয়। বাহ্মণশাসিত সমাজ, পুরুষ শাসিত সমাজের প্রতিফলন ও বিদ্যমান।

১৯২৩ খীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশিত হয়। সংগ্রাহক ছিলেন চন্দ্রকুমার দে, গীতিকার সংখ্যা-১০। চন্দ্রকুমার দে মহাশয় মৈমনসিংহ জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে কৃষকদের মুখ থেকে গীতিকা গুলি সংগ্রহ করেছিলেন। মৈমনসিংহ গীতিকার ১০টি সংকলন হল - মহুয়া, মলুয়া, কঙ্ক ও লীলা, কাজল রেখা, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের, রূপবতী, দেওয়ানা মদিনা বা আলাল দুলালের পালা। পল্লীকবিরাই মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিকার রচয়িতা। পালাগুলির রচয়িতারা হলেন - 'মহুয়া'-দ্বিজকানাই, মলুয়া-চন্দ্রাবতী, চন্দ্রাবতী-নয়ানচাঁদ ঘোষ, সকল গীতিকার রচয়িতার নাম পাওয়া যায় নি।

টিপ্পনী

৪.৪ আত্মমূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্ন ঃ

ক) গীতিকা ও Ballad এর সাধারণ পরিচয় দাও।

খ) ময়মনসিংহ গীতিকার শ্রষ্ঠা ও সংগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪.৫ মৈমনসিংহ গীতিকায় সমাজভাবনা ঃ

গীতিকাগুলি গ্রামীন সমাজজীবন নির্ভর বাস্তবতার নারীর আখ্যান অবলম্বন করে কবিরা গান বেঁধেছেন।পালাগুলিতে তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ছায়াপাত লক্ষিত হয়। গীতিকাগুলি পূর্ব-মৈমনসিংহ এলাকার বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে কোন কোনটি রচিত। সাহিত্যে সমাজ জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হতে বাধ্য। তবে মহুয়া গীতিকার যাযাবর জীবনের ঘটনা থাকায় সমাজ জীবনের ব্যাপক প্রভাব দেখা যায় না। অন্যান্য পালাতে বাংলার সামাজিক প্রভাব বর্তমান। এ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থ বলেছেন -

'পালাগানের অধিকাংশই পূর্ব-মৈমনসিংহের কোন কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে।'

'মহুয়া' পালায় যাযাবর শ্রেণীর মানুষের পরিচয় পাই। নদ-নদী, সমতল থেকে দুর্গম - পাহাড় - পর্বত অঞ্চলের কথা জানতে পারি। যাযাবর শ্রেণীর মানুষের সংস্কৃতি-মানবিকতা, সংস্কার যেমন আছে তেমনি মৈমনসিংহ অঞ্চলের জমিদার শ্রেণীর মানুষের উদারতা ও প্রেমপূর্ণ জীবনের ছবি সুস্পষ্ট। মৈমনসিংহ গীতিকায় হাজং জনগোষ্ঠী, বোড়ো জাতির মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নারীরর প্রাধান্যের কথা জানতে পারি বিবাহের পূর্বে পিতামাতার অনুমোদনের পূর্বে কমলা। মহুয়ার হৃদয় বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে চন্ডাল গৃহে প্রতিপালিত সন্তানকে বাহ্মণ গ্রহণ করতে ও বাহ্মণ কন্যা প্রতিরূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। এ কথাও সঠিক প্রতিটি নায়িকা প্রায় শিক্ষিত তাদের পত্র প্রেরণ ও কাব্য লেখার (চন্দ্রাবতী) ক্ষমতা থেকে তা প্রতিসম্পন্ন হয়। বাল্যবিবাহ দেখা যায় নি। তবে প্রণয়ে ব্যাই হয়ে আজন্ম ভুসারী হওয়া বত কাব্যে লভ্য।

হিন্দু-মুসলমানের বিবাহ ও সামাজিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সম্প্রীতির দিকটি বজায় থাকতে দেখা যায়। আবার প্রণয়মূলক গীতিকাতে নবাব, দেওয়ান, কাজী, কারকুর্ণ প্রভৃতি চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। ব্যাভিচার, রাষ্ট্রীয় পীজন, সাধু-সন্ন্যাসী, জমিদার, দেওয়ান, কাজীর নারী লোলুপতা অত্যাচারের কথাও গীতিকায় লভ্য।

তৎকালীন সমাজে এ ধরনের লক্ষ্যটা চরিত্রের মানুষের চিত্র বাস্তবসম্মত। গীতিকায় সুখী একান্নবর্তী পরিবার, কথা যেমন পাচ্ছি তেমনি দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ্য, প্লাবণ পীড়িত মানুষের চিত্র দেখা যায়। মাতৃমমতা, ভ্রাতারপ্রতি স্নেহ, বোনের প্রতি ভাইদের স্নেহ, বিপদে পাশে দাঁড়ানো, শাশুড়ীর প্রতি ভক্তি সামাজিক মেল-বন্ধন দৃড় ছিল তা বোঝা যায়। তবে অসহায় নারী চক্রান্তের ফলে সমাজ থেকে চ্যুত হতে দেখা যায়। মহুয়া বা আয়না বিবিতে তা স্পষ্ট, হিন্দু-মুসলিম সমাজে সমাজ চ্যুত করার প্রবণতাটি ধরা পড়ে। পণপ্রথার প্রচলন ছিল না। বাঙালি খাদ্যাভাস ও দ্রব্যাদির কথা দেখি কমলা পালায়। লোক সংস্কৃতির নানা সংস্কার ও বিশ্বাস গীতিকাগুলিতে বর্তমান। হিন্দু বিবাহ রীতি সম্পর্কে ধীরেন্দ্র দেবনাথ 'পূর্ববঙ্গ গীতিকায় জনজীবনে' জানালেন-

'সেকালের গ্রাম-সমাজের বিবাহ প্রথা ও বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পর্কে অনেক তথ্য গীতিকাগুলিতে মেলে।. ..... বরপণ দেবার সমস্যা সেকালে ছিল না; বরং অনেক ক্ষেত্রেই কন্যাপণ দিতে হত। তথা কথিত নিম্নবর্ণীয়েরাই অনেকে কণ্যাপণ নিতেন। শস্ত্রীয় বিধানের সঙ্গে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান মিলিয়ে বিবাহ কর্ম সম্পন্ন হত 'শরা মতে' অর্থাৎ মুসলমান শস্ত্রমতে হিন্দু বিবাহে স্ত্রী আচারের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।'

মৈমনসিংহ গীতিকায় তৎকালীন সমাজজীবনের প্রভাব এই গীতিকাগুলির 'ঐতিহাসিক মূল্যকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।'

৪.৬ মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় ময়মনসিংহ গীতিকা ঃ

ময়মনসিংহ গীতিকাগুলি মধ্যযুগের সাহিত্য হলেও তার মধ্যে চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্ত্তাগণ মনস্তত্ত্বজানের পরিচয় প্রদান করেছেন। মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলা সম্ভব। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির দিকে তাকালে দেখতে পাই অসংখ্য চরিত্রের শোভাযাত্রা তার মধ্যে কিছু কিছু চরিত্র মনস্তত্ত্ব সম্মত হয়ে ওঠায় তা বাস্তবতা লাভ করেছে। সেই চরিত্রগুলি আদো মানবিক আবেদন বহন করে চলেছে, অন্যান্য চরিত্রগুলি টাইপ চরিত্রের পর্যায়ভুক্ত। আলোচ্য গীতিকায় 'মহুয়া' পালায় মহুয়া পদ্যার চাঁদ, 'মলুয়া'য় মলুয়ার প্রেম, তার কষ্টসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল চরিত্রের প্রমান দিয়েছেন। 'কঙ্ক ও লীলা' গীতিকায় কঙ্ক ও লীলা। চন্দ্রাবতীতে লায়িকা চন্দ্রাবতী, 'কমলা'র কমলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে মনস্তত্ত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

'ময়মনসিংহ' গীতিকার 'মহুয়া' পালাটিতে সবচেয়ে বেশি আধুনিক মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় মেলে। বেদের মেয়ে মহুয়া খেলা দেখাতে এসে নদের চাঁদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। মহুয়ার উৎকণ্ঠা শুধু নয় নদেরবাঁদের উৎকণ্ঠা ও প্রতিক্রিয়া ও বাস্তবতা সম্মত। বাঁশে ভর দিয়ে খেলা দেখানোর সময় গভীর উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে -

টিপ্পনী

‘দড়ি বাইয়া উধ্যা যখন বাশে বাদী করে
নদ্যার ঠাকুর উধ্যা কয় পইর‍্যা নাকিমরে।’

খেলা শেষে নদ্যার ঠাকুরের কাছে বকশিস্ প্রার্থনা করলেও নায়ক –
‘মনে বলে নদ্যার ঠাকুর মন যেন তার পাই।’

এ ভাবেই হৃদয় বিনিময়ের মনস্তাত্ত্বিক খেলা শুরু হল। জলের ঘাটে দুজনে জ্যোৎস্না স্নাত হয়ে হৃদয়ের কথা বলতে লাগল। পূর্বকথা স্মরণ করালেও মহুয়া তা বিস্মৃত হওয়ার যে ভাব করতে লাগল তা প্রেমিক নর-নারীর হৃদয়কথা।

টিপ্পনী

মহুয়ার হৃদয়ে গভীর প্রেম থাকলেও সরাসরি নদ্যার ঠাকুর প্রেমের কথা জিজ্ঞাসা করলে –

মহুয়ার উক্তি –

‘লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জ নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর।’

উত্তরে নদের বাঁদের চিরন্তর প্রেমিক হৃদয়ে গভীর কথা –

‘কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ি।
তুমি হত সহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যামরি।।’

পিতা হুমরা বেদে বিষলাক্ষের ছুরি মহুয়ার হাতে তুলে দিলে দারুণ মানসিক যন্ত্রণার শিক্ষার হতে দেখা যায় মহুয়াকে। অবশেষে নদের বাঁদের সঙ্গে গভীররাতে গৃহ ছাড়া হয়েছে। তার উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বিপদ থেকে মুক্ত হতে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত পিতার দেওয়া ছুরিতে সে নিজেকে প্রেমের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। কন্যার জন্য হুমরার হাহাকার, পালং সইয়ের হৃদয় বিদারক কান্না খুবই বাস্তব।

‘মলুয়া’ পালায় মলুয়া চরিত্রটি খুবই বাস্তব ও উজ্জ্বল। বিনোদের রূপমোহে আকৃষ্ঠ হয়ে জলের ঘাটে নায়ককে জাগানোর যে কলসীতে জল ভরানোর শব্দে তা খুবই বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক–

‘কাঁদের কলসী ভূমিতে থইয়া মলুয়া সুন্দরী।
লামিল জলের ঘাটে অতি তরাতরি।।
একবার লামে কণ্যা আর বার চায়।
সুন্দর পুরুষ এক অঘুরে ঘুমায়।।’

মলুয়ার রোমান্টিক হৃদয়ের পাশাপাশি প্রেমের সাথে নিজের এগিয়ে এসেছে তার মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা –

‘শুনরে পিতলের কলসী কইয়া বুঝাই তরে।
ডাক দিয়া জাগতে তুমি ভিন্ন পুরুষেরে।।
এত বলি কলসী কণ্যা জলেতে ভরিল।
জল ভরণের শব্দে বিনোদ জাগিয়ে উঠিল।।’

‘কঙ্ক ও লীলা’য় কঙ্ক ও লীলার সখ্যতা। তা যৌবনে গভীর প্রেম –

‘আইস আইস প্রাণের বন্ধুরে বইস আমার কাছে।
দেখিব তোমার মুখে কত মধু আছে।।
তুমি হও তরুরে বন্ধু আমি হই নাতা।
বেইরা রাখব যুগল চরণ ছাইড়া যাইব কোথা।।’

কঙ্কের প্রতি গর্গের নিষ্ঠুরতা। লীলার পরামর্শে কঙ্কের গৃহত্যাগ অবশেষে লীলা মৃত্যু এক বিষদে ঘন পরিবেশ তৈরি করেছে। গর্গের ভুল ভাঙছে তার হৃদয় হাহাকার –

টিপ্পনী

‘হায় কঙ্ক এতকাল কোথা তুমি ছিলে।
তোমায় ডাকিয়াছে লীলা মরণের কালে।।
কিসের সংসার-ঘর কি হবে আমার।
মায়ের বিহনে আমার সকল অন্ধকার।।’

গীতিকার খুব বাস্তব সম্মত ভাবেই গর্গের অতিনাদ জীবন্ত করে তুলেছেন।

‘চন্দ্রাবতী’ কাব্যে চন্দ্রাবতী প্রেম তার অভিমান খুবই বাস্তব সমস্তত্ত্ব সম্মত। ছোট থেকেই জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর সখ্যতা দেখতে পাই দুজনই শিক্ষিত। দুজনের বিয়ের পরিপূর্ণ আয়োজন বলে বিয়ের দিন জয়ানন্দের সংবাদ এসে পৌঁছায় যে মুসলিম কন্যা বিয়ে করেছে। মনকষ্টে চন্দ্রাবতী পাথরে পরিণত হয়েছে। সেই হৃদয় অনুভূতির কথা গীতিকা রচয়িতার লেখায় –

শুনিয়া হইল চন্দ্রা পাথর যেমন।।
না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী।
আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী।।
সনেতে ঢালিয়া রাখে মনের আগুনে।
দানিতে না দেয় কন্যা জল্যা সরে সনে।।

শিশুকাল থেকে যার সঙ্গে এত সম্পর্ক সে যে এমন করতে পারে তা চন্দ্রাবতীর কাছে কল্পনাতীত। তাই যে জীবনের চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আজন্ম বিবাহ না করে শিবপুজা ও রামায়ণ রচনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করবে। জয়ানন্দেরও মোহ ভঙ্গ হয়েছে কিন্তু ি দয়ে এসে আর আর চন্দ্রাবতীকে পায় নি। সেও জীবন বিসর্জন দিয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্য করেছে –। অন্তিমে নদীর জলে মৃত জয়নন্দের দেখা ও তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া –

‘আখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী।
পাবেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী।।
স্বপ্নের হাসি স্বপ্নের কান্দন নয়ান্ চান্দেগায়।
নিজের অন্তরের দুস্কু পরকে বুঝান দায়।।’

এমনই মনস্তত্ত্ব সম্মত চরিত্রে সন্ধান পাই পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলিতে যা কবিদের স্বকীয়তার প্রমাণ দেয়।

৪.৭ নির্বাচিত গীতিকার সাধারণ পরিচয় ঃ

মহুয়া ঃ

দ্বিজ কানাই প্রণীত গীতিকা মহুয়া। এটি জনপ্রিয়া ও আদর্শ গীতিকা। ২৪টি পরিচ্ছেদে গীতিকাটি বিভক্ত। পালক পিতা হুমরা বেদে, পালিত কন্যা মহুয়ার বেড়ে ওঠা এবং বেদের দলের প্রাণ স্বরূপ হয়ে উঠলেও জমিদার সন্তান নদের বাঁদ সঙ্গে তার হৃদয় বিনিময়ের কারণে তাদের গীতিকার অন্তিমে শোচনীয় পরিণতি। মহুয়ার ত্যাগ বিচক্ষণতা ও প্রেমের গভীরতা লক্ষ্য করা যায়। তাদের প্রেম আর গোপন থাকে না - একদিন হুমরা বেদে তা জেনে ফেলে। নদের বাঁদের কাছ থেকে চাষ-বাসের জমি পেলেও মহুয়ার প্রেম হুমরা মেনে নিতে অপারগ। মহুয়া তাদের দলের সম্পদ তাকে বিসর্জন সম্ভব নয় তাই প্রেমের প্রতিবন্ধকতা নেমে আসে।

টিপ্পনী

হুমরা দলের প্রধান তার কথাতেই সমগ্র বেদের দল চালিত হয়। তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানিকের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে রাতের অন্ধকারে নতুন দেশের উদ্দেশে পাড়ি সমান। নদ্যার বাঁদ মহুয়ার জন্য পাগল প্রায় হয়ে মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সম্মানে বেরিয়ে পড়ল। অবশেষে তাদের সাক্ষাৎ, হুমরা মহুয়াকে বিষমাখানো ছুরি দিয়ে নদ্যারবাঁদকে হত্যা করতে বললে তার মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং প্রেমের জন্য জীবন বাজি রেখে রাতের অন্ধকারে দুজনে পালিয়ে যায়। ঘটনাক্রমে নৌকার বণিক অরণ্য মধ্যে সন্ন্যাসীর কবল থেকে সুন্দরী মহুয়া উপস্থিত বুদ্ধির জোরে উদ্ধার এবং প্রেমিককে নিয়ে নিরাপদ স্থানে গমন। এ গীতিকায় প্রেমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রেমের জন্য দুই যুবক যুবতী সমাজ-সংসার, পিতা-মাতাকে ত্যাগ করতে দেখা যায়। অবশেষে হুমরার নির্দেশে নদেরবাঁদের প্রাণ হরণের নির্দেশ। কন্যা মহুয়া ও নদেরবাঁদের সমাধির পর পালং সইয়ের মর্মবেদনা হুময়ার একাকিত্ব চোখে পড়ে। এমনই এক বিয়োগান্তক পরিণতিতে কাব্যটির সমাপ্তি।

মলুয়া ঃ

মৈমনসিংহ গীতিকায় 'মলুয়া' গীতিকায় মলুয়া ও চাঁদ বিনোদের প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তবে মহুয়া পালার মতো এ গীতিকাও বিয়োগান্তক। এ পালায় বন্যা প্লাবনের কথা আছে। আছে জীবিকা পরিবর্তনের ইতিহাস। চাঁদ বিনোদ কুড়া শিকারে বেরিয়ে ক্লান্ত হয়ে নির্জন জলের ঘাটে বৃক্ষছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। পুকুরের ঘাটে হল আনতে গিয়ে মলুয়ার চাঁদ বিনোদকে প্রথম দর্শন, কাব্যে রূপদর্শন জনিত ভালোলাগা থেকে হৃদয়ের প্রেমের অঙ্কুর। কলসিতে জল ভরার শব্দ করে ভিনদেশী পুরুষকে জাগানো পরে বাড়ির পথ নির্দেশ এবং অতিথি হওয়ার আমন্ত্রণ জানায় মলুয়া। অবশেষে তাদের মধ্যে বিয়ে সংঘটিত হয়।

মলুয়ার চাঁদ বিনোদের জীবনে নেমে আসে প্রতিবন্ধকতা। দুরাচারী কাজী মলুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাবার জন্য দূত পাঠিয়ে ব্যার্থ হয়ে দেওয়ানের কাছে বিনোদের নামে নজরানা না দেওয়ার কথা শোনায়। চাঁদবিনোদের পরিবারে নেমে আসে অন্ধকার। মলুয়ার উপস্থিত বুদ্ধি লক্ষ্য করা যায় - কাজীর কূটনীতির যোগ্য শাস্তি সে দেওয়ানকে দিয়ে করিয়েছে। দেওয়ানকে বতের ছলনা করে দূরে সরিয়ে রেখে নৌকা ভ্রমণের গিয়ে কুড়ার মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়ে দেয় ভাইদের কাছে। এ ভাবেই সে উদ্ধার করে সবাইকে এবং নিজেকেও মুক্ত করে। মুসলমান গৃহে

থাকার কারণে আত্মীয়দের প্রবল চাপে চাঁদবিনোদ তাকে ত্যাগ করে এবং দ্বিতীয়বার বিয়েও করে। সতী মলুয়া দাসী হয়ে বিনোদের গৃহে থাকতে চাইলেও তাকে সুযোগ দেওয়া হয় নি। আত্মীয় সজনের চাপের মুখে বিনোদ সব কিছু মেনে নিয়েছে। এদিকে মলুয়া জীবনের প্রতি বীতরাগী হয়ে অভিমানিনী নৌকায় উঠে মাঝ নদীতে প্রাণ বিসর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এমনই বিয়োগান্তক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে গীতিকার যবনিকাপাত ঘটেছে।

কঙ্ক ও লীলা ঃ

টিপ্পনী

কঙ্ক ও লীলা দুজনেই বল্যকালের বন্ধু। বয়স পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রণয় গারতর হয়েছে। গুণরাজ খানের পুত্র ছ'মাস বয়সে কঙ্ক মাতৃহারা হয়। পরে পিতারও মৃত্যু হয়। অসহায় কঙ্ককে মরারি ও কৌশল্যা নামে এক চন্ডাল দম্পতি লালন-পালন করেন। পালকপিতা মাতার মৃত্যু হলে তার ঠিকানা হয় গর্গ ও গায়ত্রীর কাছে। গায়ত্রীর মৃত্যু হলে কঙ্ক গর্গের আশ্রয়ে রয়ে গেল। ছোট লীলা ও কঙ্কের সহোদরের সম্পর্ক। কঙ্ক গর্গের কাছে নানা শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। এরপর এক পীরের নিকট কঙ্ক দীক্ষা গ্রহণ করল। গুরুর আদেশে সত্যপীরের পাঁচালি রচনা করলেম। তার যবনের প্রীতি গোঁড়া বাহ্মণদের সহ্য হল না। হিন্দুরা তাকে সমাজচ্যুত করল। কঙ্ক ও লীলার প্রেমের কথা গর্গের কানে পৌঁছালে দুজনকে হত্যার পরিকল্পনা করে খাদ্যের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিলেন। লীলা জানতে পেরে কঙ্ককে গৃহত্যাগ করা পরামর্শ দেয়। গর্গের প্রতি তার স্নেহ ভালোবাসা কোনদিন কমেনি তাই যাত্রার পূর্বে লীলাকে পিতাকে দেখার জন্য অনুরোধ জানায়।

কঙ্কের জন্য বিরহ আনলে দগ্ধ হয়ে লীলা মৃত্যুপথ যাত্রী। অবশেষে লীলার মৃত্যু হয়। এদিকে গর্গ অথধর পাঠিয়েও কঙ্কের কোন সন্ধান পেলেন না। লোক মুখে জলে ডুবে তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এ সংবাদ কানে গেলে লীলা জীবনে বেঁচে থাকার সব আশা মুছে মনে করে আরো দ্রুত মৃত্যু দিকে চলে পড়েছে। কঙ্ক যখন গর্গের স্থানে ফিরে আসল তখন লীলাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবশেষে প্রদক্ষিণ করে অন্তিম সম্মান জানিয়ে প্রেমিক কঙ্ক নীলাচলের পথে পাড়ি দিলেন। এভাবেই কঙ্ক ও লীলা গীতিকার গভীর দুঃখময় পরিসমাপ্তি

চন্দ্রাবতী ঃ

নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত চন্দ্রাবতী কাব্যটি মানুষের মুখে প্রচারিত কিছু কাহিনী ইতিহাস নিষ্ঠতার দিকে নিয়ে যায়। নাটকীয়তার দিক দিয়েও গীতিকাটি শিল্পসম্মত। পুজার ফুল তুলতে গিয়ে জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর পরিচয়। দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর সঙ্গে জয়ানন্দের হৃদয় সম্পর্কে গড়ে ওঠে। এ দিকে জয়ানন্দ চিঠি লিখে তার প্রেমিক হৃদয়ের কথা চন্দ্রাবতীকে জানিয়ে দেয়। চন্দ্রাবতী পিতৃ আদেশ ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না। হৃদয়ে প্রেমিক পুরুষের জন্য থাকলেও অন্তরের ইচ্ছাকে গোপনে রাখতে হয়েছে ঘটনাচক্রে ঘটকের আগমন এবং জয়ানন্দের চন্দ্রাবতীর বিবাহ স্থির হয়। বিয়ের সকল আয়োজন সম্পন্ন, বিয়ের দিন সংবাদ আসে জয়ানন্দের অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে। চন্দ্রাবতীর জীবনে নেমে আসে শোকের ছায়া। জয়ানন্দ এমন বিশ্বাসহীন কাজ করতে পারে তা স্বপ্নেও চন্দ্রাবতী ভাবেনি। কন্যার জন্য বংশীদাস অন্যস্থানে পাত্রের সংবাদ করলে চন্দ্রাবতী ধনুকভাঙা পণ করে বসে সে আর জীবনে বিবাহ করবে না। চন্দ্রাবতী শিক্ষিতা আধুনিক মনস্ক তরুণী। অভিমান হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

টিপ্পনী

জয়ানন্দ মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করেছে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তার মোহ ভঙ্গ হয়। বিস্ময় জীবনে চন্দ্রাবতীর কথা মনে পড়ে অনুতপ্ত জয়ানন্দ তার কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে পত্র লিখে পাঠাল চন্দ্রাবতীর উদ্দেশে। চন্দ্রাবতী নিজের সিদ্ধান্ত অনড়। পিতা তাকে শিবপুজা ও রামায়ণ লিখে জীবন অতিবাহিত করার নির্দেশ দিলেন। পিতার নির্দেশে পত্রের উত্তর ও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করার কথা বলেন। জয়ানন্দের অক্ষুন্নতা প্রবল আকার ধারণ করে। সে মন্দিরে এসে চন্দ্রাবতীর নামধরে ডাকতে থাকে সাড়া না পেয়ে মন্দিরগত্রে তার উপস্থিতির কথা জানিয়ে অভিমানী জয়ানন্দ নদীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। চন্দ্রাবতী মন্দির থেকে বেরিয়ে জয়ানন্দের উপস্থিতি বুঝতে পেরে স্থান অপবিত্র হয়েছে ভেবে নদীর দিকে কলসী নিয়ে স্নানের জন্য উপস্থিত হয়ে দেখলে নদীর জলে পূর্ণিমার চাঁদের মতো জয়ানন্দের দেহ ভাসছে। কূলে ছাঁড়িয়ে চোখের জলে স্নাত হয়ে চলেছে চন্দ্রাবতী। চোখের জলে গীতিকাটির সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন নয়ানচাঁদ ঘোষ।

কাজল রেখা ঃ

রূপকথা ধর্মী কাহিনী নির্ভর গীতিকা 'কাজল রেখা'। ঘটনা বহুল এই গীতিকায় দৈব নির্দেশে কাজল রেখার জীবনে জটিলতা নেমে আসে এবং একের পর এক অবাঞ্ছিত চমকপ্রদ ঘটনার আগমন। কাজল রেখা দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে যে হার মানে নি। তার কাঙ্খিতকে শেষ পর্যন্ত লাভ করেছে। 'কাজল রেখা' পালাটির শুরু থেকেই দেখি গান, গদ্য ও পদের এক অদ্ভুত সমাহার। মৈমনসিংহ গীতিকায় কাজল রেখা একটু ভিন্নধর্মী।

কাজল রেখা সাধু ধনেশ্বরের কন্যা। ধনেশ্বর একজন বণিক সম্প্রদায়ের মানুষ। তাকে এক সাধু যে শুকপাখি দিয়েছিল সেই শুক জানায় মৃত স্বামীর সঙ্গে কাজল রেখার বিবাহ দিতে হবে। পিতার কথামত মৃত স্বামীর সঙ্গে তার বিবাহ মেনে নেয়। পিতা ধনেশ্বর বাণিজ্যের নাম করে তাকে গভীর অরণ্যে রেখে আসে। বনমধ্যে এক মন্দির দেখতে পেয়ে কাজল রেখা তার মধ্যে প্রবেশ করে সর্বাঙ্গে সূঁচবিদ্ধ এক মৃত দেহ দেখতে পায়। পিতার কথা স্মরণ করে তাকেই স্বামী হিসাবে মেনে নেয়। কিছু পরে মন্দির অভ্যন্তরে এক সন্ন্যাসীর প্রবেশ ও মৃতদেহ কে বাঁচাবার পথ নির্দেশ। এ কৃচ্ছ্র সাধনায় সে রাণী হয় এবং শেষ পর্যায়ে পৌঁছে তার জীবনে ঘটে আবার বিপর্যয়। তার কঙ্কনের বিনিময়ে যে হত দরিদ্র বৃদ্ধের কাছ থেকে তার কন্যাকে নিজের কাছে নিয়েছিল, সেই কন্যাই তার সরলতার সুযোগ নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। কঙ্কন দাসীই নকল রাণী সেজে রাজ প্রাসাদে উঠল আর কাজল রেখা দাসী হয়ে রইল। রাজকুমারের বন্ধু ও নকল রাণীর প্ররোচনায় কাজল রেখাকে আবার বনবাসে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। বন্ধুর হাত থেকে সতীত্ব রক্ষা, নিজের ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। শুক পাখির প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন পরে 'কাজল রেখা'র জয় সম্ভব হয়। এক যুগ ধরে তাকে নানা পরীক্ষার সুখাপেক্ষী হতে হয়েছে – নকল রাণী কঙ্কন দাসীর শাস্তি ও স্বামীর সঙ্গে কাজল রেখার মিলন সম্ভব হয়েছে। এই গীতিকাটি মিলনাত্মক। মৈমনসিংহ গীতিকার শোকের মিছিলে এমনই দু-একটি পালা মিলন সুখ এনে দিয়েছে।

৪.৮ ময়মনসিংহ গীতিকার কাব্যসম্পদ ঃ

ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনী সঞ্চয়ণ চরিত্র নির্মাণ। মনস্তত্ত্ব সংযোজনা, বাস্তবতা, উপন্যাস, নাট্যলক্ষণ, গীতিপ্রবণতা পালাগুলির প্রাণ। গীতিকার রচয়িতাগণ রূপকথা, ইতিহাস, সমাজবাস্তবতা, লোক প্রচলিত কাহিনীকে কখনো গান, সংলাপ, গদ্য মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। সবগুলিই মাটির মানুষের নিজস্ব সম্পদ। গীতিকাগুলি Ballad লক্ষণাক্রান্ত। বেশিরভাগ গীতিকা বিয়োগন্তক অর্থাৎ ট্রাজিকরস প্রাধান্য পেয়েছে।

টিপ্পনী

পালাগুলিতে নাটকীয়তা ও গীতিময়তা দুই দেখা যায়। ঘটনার উপস্থাপনা ও সংযোজনা নাট্যগুণকে বর্ধিত করেছে, আবার 'কাজল রেখা'র মতো রূপকথার কাহিনীও আমাদের হৃদয়হরণ করে। 'চন্দ্রাবতী' গীতিকায় পত্র ব্যবহার - জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর প্রেমের পথ প্রশস্ততার পরিচয় জ্ঞাপক। জয়ানন্দের হঠাৎ মুসলমান কন্যাকে বিবাহ এবং চন্দ্রাবতীর কুমারী বতের নাটকীয় সিদ্ধান্ত সংযমতার পরিচয় দান করেছে। মহুয়া পালায় মহুয়া নাটকীয় ভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উপস্থিত বুদ্ধির জোরে উদ্ধার হয়েছে। তা চরিত্রটির অদম্য প্রাণশক্তির পরিচয় পাই। প্রতিটি গীতিকাহন লোককাহিনীধর্মী নাট্য সংলাপের মত উপস্থাপন কৌশল। নাটকে যেমন থাকে জীবনের দ্বন্দ্ব তেমনি গীতিকাগুলিতে চরিত্রগুলির দ্বন্দ্বময়তা লক্ষিত হয়। আবার ঘটনাগত দ্বন্দ্ব, আত্মদ্বন্দ্ব-সংকট সবই মহুয়া নদ্যার ঠাকুর ও দুমরা বেদের মধ্যে দেখা দেয়। 'দেওয়ান ভাবনা' পালাতেও নাট্য দ্বন্দ্ব ও নাটকীয় ঘটনার চমৎকারিত্ব রূপ পেয়েছে। গীতিকায় ঘটনার শুরু উত্থান-পতন সবই লক্ষিত হয়।

ময়মনসিংহ গীতিকায় বাস্তবতা, প্রকৃতি, চরিত্র, কাহিনী ও সমাজ জীবনের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। এই সকল লক্ষণ দেখে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -

'এই বাস্তব উপাদানের প্রাচুর্য্যের জন্যই উপন্যাস সাহিত্যের অগ্রদূতের মধ্যে ময়মনসিংহ গীতিকার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আংশিক হইলেও বাস্তবতার দিক দিয়া একেবারে নিখুঁত। কি প্রকৃতি বর্ণনা, কি রূপ বর্ণনা ও চরিত্র চিত্রণ, সর্বত্রই এই অকুণ্ঠিত বাস্তবতার চিত্র সুপরিস্ফুট।'

('বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা')

গীতিকায় ঘটনার কাট কারণ সম্পর্কে, চরিত্রের ও ঘটনার ক্রমবিকাশ, বাস্তবতা, পল্লীকবিদের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা গীতিকায় বর্তমান। গীতিকার মধ্যে উপন্যাসের এই লক্ষণগুলি প্রত্যক্ষ করা যায়।

গীতিকাগুলিতে উপমা সংযোজনায় কাব্য সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে -

'চন্দ্রাবতী'তে তার আবির্ভাবে -

'আবে করে ঝিলিমিলি সোনার বরণ ঢাকা।
প্রভাতকালে আইল অরুণ গায়ে হলুদ মাখা।।'

'মহুয়া' পালাতে -

'পিঞ্জুরায় বাইন্ধা রাখছে পাগলা পঙ্খিনী।

ফুল যদি হই তারে বন্ধু ফুল হইতে তুমি
কেশেতে ছাপাই রাখতাম ঝাইড়িয়া বানতাম বৈণী।।'

'মহুয়া' পালায় মলুয়াকে দেখে বিনোদের প্রতিক্রিয়া গীতিকা রচয়িতার প্রকৃতির উপমা অবলম্বন-

'দেখিল সুন্দর কন্যা জল লইয়া যায়।
মেঘের বরণ কন্যার গায়েতে লুটায়।। এইত
কেশ না কন্যার লাখ টাকার মূল। শুকনা
কানলে যেন মহুয়ার ফুল।।
.....
জলের না পদ্ম ফুল শুকনায় ফুটে রইয়া। আ
সমানের তারা ফুটে মঞ্চেতে ভরিয়া।।'

টিপ্পনী

অলঙ্কার ব্যবহারেও গীতিকারগণ নৈপুন্য দেখিয়েছেন -

'মহুয়া' -

'এইত কেশ না কন্যার লাখ টাকার মূল।
শুকনা কাননে যেন মহুয়ার ফুল।।'
'চন্দ্রাবতী' - 'বিনামেঘে হইল যে শিরে বজ্রাঘাত।'
'দক্ষিনের হাওয়া বয় কুকিল করে রা।
আমের বউলে বস্যা গুঞ্জে ভ্রমরা।।'
'ঢেউয়ের উপর ভাসে পুন্নুমাসীর চান।।'

'কমলা' -

'এক পুত্র হইল তার নামেতে সুধন।
রূপেতে জিনিয়া যেন রতির মদন।।'
'শুন শুন শুন ওগো চিকন গোয়ালিনী।
তোমার ও যৌবন ছিল জোয়ারের পানি।।'
'আইল ফাল্গুন মাস বসন্ত বাহার।
লতায় পাতায় ফুটে ফুলের বাহার।।'

ময়মনসিংহ গীতিকায় - রূপকথা, রোমহর্ষক ঘটনা ব্যালাড ধর্মীতা লক্ষ্য করি। তেমনি পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নদনদী, পাহাড়, অরণ্য, পশুপাখি, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাস, ধর্মীয় মানুষের আগমন সব নিয়ে এক ধর্ম নিরপেক্ষ সাহিত্য গড়ে উঠেছে। গ্রাম বাংলার মাটির মানুষের কল্পনা-আশা-আকাঙ্খা যেন এই গীতিকা পূরণ করেছে। এই গীতিকা উদ্ধারের পর বিশ্বসাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করেছে অনুবাদের দলে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। সব দিক দিয়ে বিচার করলে এর সাহিত্য মূল্য মূল্যাতীত।

8.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলী ঃ

১. গীতিকা ও Ballad এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২. 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গগীতিকা'র বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ কর।

৩. মৈমনসিংহ গীতিকায় কবিদের সমাজভাবনার পরিচয় প্রদান কর।

৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দেবনির্ভরতার যুগে মৈমনসিংহ গীতিকার অভিনবত্ব বুঝিয়ে দাও।

৫. মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি নারীপ্রধান – যুক্তি সহকারে বোঝাও।

৬. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' সংগ্রহের ইতিহাস বিবৃত করুন।

৭. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নাট্যলক্ষণযুক্ত তা পর্যালোচনা কর।

টিপ্পনী

৪.১০ সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

১. ময়মনসিংহ গীতিকা – (সম্পা.) সুখময় মুখোপাধ্যায়।

২. মৈমনসিংহ গীতিকা – (সম্পা.) দীনেশচন্দ্র সেন।

৩. মৈমনসিংহ গীতিকা – (সম্পা.) আশরাফ সিদ্দিকী।

৪. বাংলা লোকসাহিত্য – আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত – অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬. বাংলা সাহিত্য পরিচয় – পার্থ চট্টোপাধ্যায়।